KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher নীহার রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৫০/১১ ৫০/১২	Year of Publication : ফাল্গুন ১৩৯৬ // March 1990 চৈত্র ১৩৯৬ // April 1990
	Condition : Brittle Good ✓
Editor আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ একাদশ সংখ্যা মার্চ ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

"উচ্চশিক্ষার গঙ্গাযাত্রা"—এই সন্দর্ভে অভিজ্ঞতার আলোয় উচ্চশিক্ষার সংকটজর্জর অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য।

ব্যতিক্রমী সাহিত্যপ্রতিভা "মহাস্থবির জাতক"-এর স্রষ্টা প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্মশতবর্ষে তাঁর সাহিত্যকৃতির অধ্যাপক অলোক রায়-কৃত মূল্যায়ন—"এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর"।

বাঙলা ছোটোগল্পকে যাঁরা বিশ্বমানে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পগুলি নিয়ে অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্তের আলোচনা—"গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মতো"।

অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায়ের প্রতিবেদন "চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক সংস্কার—ভারতের কী শিক্ষণীয় ?"

অশোক মিত্রের আত্মজৈবনিক লেখায় বর্ণিত ৪৬'-এর দাঙ্গাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্র।

অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধরের গ্রন্থসমালোচনাভিত্তিক সন্দর্ভ "শতবর্ষের বৃদ্ধ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে আগ্রহ আজো সমান জাগরুক"।

মঞ্জুষ দাশগুপ্তের নাট্যসমীক্ষা "ফিরদৌসী মজুমদারের কোকিলারা ঃ স্মরণীয় একক অভিনয়"।

চিত্রকলা-সমীক্ষা—"বুদ্ধিমার্গের শিল্পী তায়েব মেহতা"।

ওড়িয়া সাহিত্যে সচ্চিদানন্দ রাউত রায় এবং তাঁর কিছু কবিতা।

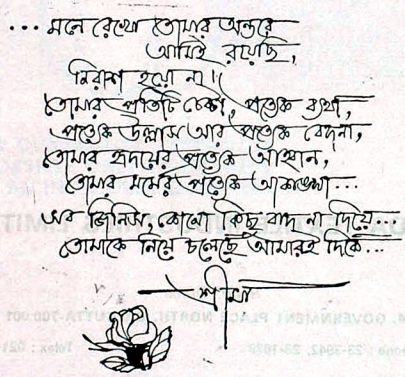

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা ...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৯০
ফাল্গুন ১৩৯৬

উচ্চশিক্ষার গঙ্গাযাত্রা সন্তোষ ভট্টাচার্য ৯১২
চীন এবং সোবিয়েতে অর্থনৈতিক সংস্কার জয়ন্তকুমার রায় ৯৩১
'গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মতো' বিজিতকুমার দত্ত ৯৪২
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর অলোক রায় ৯৫৩

দিগন্ত বিষাদ সুকুমার চৌধুরী ৯২২
ওদিকে সমূহ জুড়ে থাকে সন্তোষকুমার মাজী ৯২৩
নারী মীনাক্ষী ঘোষ ৯২৪
বিভূতিভূষণ ঊর্মিলা চক্রবর্তী ৯২৫

একটু বসার জায়গা মিহির ভট্টাচার্য ৯২৬

গ্রন্থসমালোচনা ৯৬৩
পুলকনারায়ণ ধর, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, গৌতম সেনগুপ্ত, সনাতন মিত্র

নাটক ৯৭৭
কোকিলারা : স্মরণীয় একক অভিনয় মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

চিত্রকলা ৯৮০
বুদ্ধিমার্গের শিল্পী তায়েব মেহতা সমীর ঘোষ

প্রতিবেশী সাহিত্য ৯৮৩
ওড়িয়া সাহিত্যে সচ্চিদানন্দ রাউতরায় এষা দে

মতামত ৯৯০
অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, অনিলচন্দ্র সাহা

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

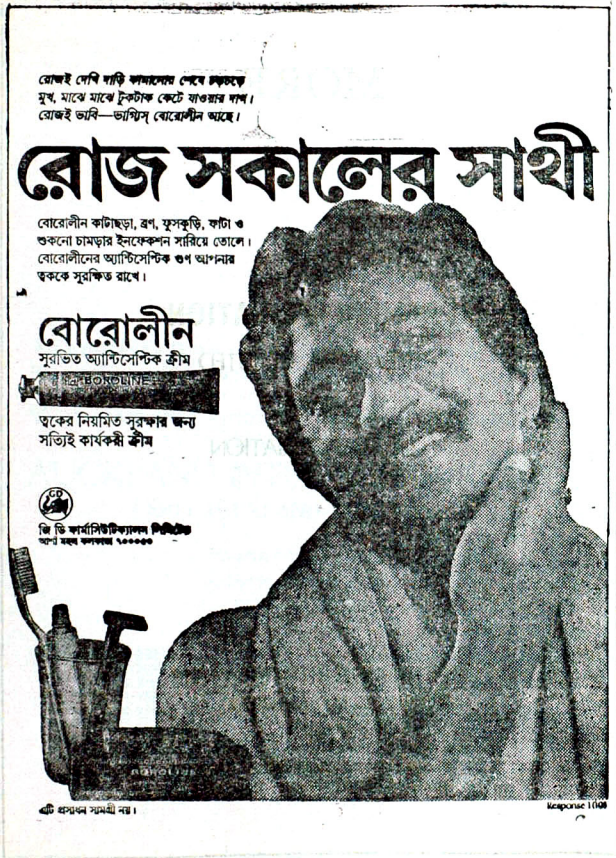

উচ্চশিক্ষার গঙ্গাযাত্রা

সন্তোষ ভট্টাচার্য

প্রাক-স্বাধীনতা প্রজন্ম প্রায়ই বিলাপ করেন যে স্বাধীনতালাভের পরবর্তী যুগে উচ্চশিক্ষার মান ক্রমেই অবনতির পথে। তখনকার দিনের সাধারণ ম্যাট্রিক-পাশ ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি এবং লেখাপড়ায় যা দখল ছিল, আজকাল গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যেও তার অভাব দেখা যায়। শিক্ষাবিদেরাও মনে করেন যে, এই অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। তবে, এর কারণ সম্পর্কে সব শিক্ষাবিদ একমত নন। কেউ মনে করেন যে, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে উচ্চ-শিক্ষার পরিকল্পনাহীন প্রসারই মানের অবনতির কারণ। কেউ বা মনে করেন—শিক্ষায়, বিশেষত উচ্চশিক্ষায়, গণতন্ত্র তথা রাজনীতির অনুপ্রবেশই যত নষ্টের মূল। অনেকের মতে, উচ্চশিক্ষায় রাষ্ট্রের আবশ্যিক আর্থিক সাহায্য কালগ্রাসের পর্যায়ে পৌঁছানোর ফলেই উচ্চশিক্ষার এই অবস্থা। স্থানকালপাত্রভেদে, বিশেষত আমাদের মতো নানা ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিভিন্ন জনসমষ্টির দেশে, কোনো-কোনো অতিরিক্ত বিশেষ কারণ বা কারণ-সমূহের দ্বারা, উচ্চশিক্ষা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হয়েছে। তবে, প্রথমোক্ত তিনটি কারণের প্রভাব সর্বব্যাপী এবং সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। বর্তমান আলোচনার পরিসর ওই তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

এক

স্বাধীনতালাভের পর, আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রসার অভূতপূর্ব তো বটেই, সামাজিক প্রগতির অন্যান্য পরিচায়কের তুলনায় বোধ হয় দ্রুততম। কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বাধীনতালাভের পর, ১৯৫০ সালে, ওই সংখ্যা ছিল ২৬৩,০০০। ১৯৬৫ সালে উচ্চশিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৩৯৪,০০০। বৃদ্ধির হার ৪·২ গুণ। পশ্চিমবঙ্গের ভবতোষ দত্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৮০ সালে ওই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৪৪২,০০০। অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের পর ত্রিশ বৎসরে, উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯·৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। ওই একই সময়ে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল ১·৯ গুণ। উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের প্রায় পাঁচ গুণ।

বিদেশী শাসকদের ভারতীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষাপ্রসারে অনীহার কারণে মনে হতে পারে যে, স্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার উল্লিখিত দ্রুত প্রসার, প্রাক-স্বাধীনতা যুগের অবদমিত আকাঙ্ক্ষারই বিস্ফোরণ। কিন্তু

সমাজের বিকাশ অন্যান্য স্তরেও তো রুদ্ধ ছিল। অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর দেশে, সাক্ষর হওয়ার ইচ্ছা তো আরও অদম্য হওয়ার কথা। প্রাসঙ্গিক তথ্যের রায় অন্যপ্রকার। ১৯৫০ সালে, দেশে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৬০,৩২০,০০০। ১৯৮০ সালে, ওই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৯,৮২০,০০০। অর্থাৎ, সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ৪.১ গুণ বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় নিশ্চয়ই অধিক, প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায়, সাক্ষর ব্যক্তির বৃদ্ধির হার অর্ধেকেরও কম।

সামাজিক বিকাশের অন্যতম পরিচায়ক জনসাধারণের জন্য চিকিৎসাব্যবস্থা। পরিসংখ্যান বলে যে, ১৯৮০ সালে, ১৯৫০ সালের তুলনায়, সরকার-অনুমোদিত চিকিৎসকের সংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৪ গুণ, এবং হাসপাতালে শয্যার বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬ গুণ। স্পষ্টতই, কি সাক্ষরতাপ্রসারে, কি জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থার প্রসারে, আমাদের কৃতিত্ব উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের তুলনায় অনেক পশ্চাতে।

স্বাধীনতা-উত্তর ত্রিশ বৎসরে, উচ্চশিক্ষার্থীদের সংখ্যাই মাত্র বৃদ্ধি পায় নি, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার বৃদ্ধিও বোধ হয় অতুলনীয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, ১৯৪৭ সালে, সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২০। তাদের অধীনে অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ১,৩৯৫। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪ এবং আরও ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় মনজুরি কমিশন কর্তৃক 'স্বীকৃত' বিশ্ববিদ্যালয়। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫৬৫। ১৯৮০ সালে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'স্বীকৃত' বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২৫ এবং অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৪২৫। অর্থাৎ, ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুলনীয় সংস্থার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ছয় গুণ এবং অনুমোদিত কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় আড়াই গুণ। ১৯৮০ সালের কলেজের সংখ্যার মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা বাদ আছে। তাদের হিসাবে আনলে, কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধির হার আরও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গেও উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রসার প্রায় সমহারে। ১৯৪৭ সালে, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটিই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮০ সালে সংখ্যা দাঁড়ায় ৮। ১৯৪৭ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৬৮টি অনুমোদিত কলেজ ছিল। ১৯৮০ সালে, পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত কলেজের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২০।

প্রশ্ন এই যে, উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার এই প্রসার শিক্ষণমান অনুযায়ী হয়েছে কি না? এবং জাতির ঈপ্সিত পথে আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে কি না?

এ যাবৎ আমাদের দেশে যতগুলি শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছে, তাদের সবাই একমত যে, উচ্চশিক্ষার প্রসার ভারসাম্যহীন, এবং প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিহীন। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০ বা ততোধিক। অন্যদিকে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল অনধিক ৫০। অনুমোদিত কলেজের ছাত্রসংখ্যাও ছিল ভারসাম্যহীন। কোঠারি কমিশন মোট যে ২,০৫৬টি অনুমোদিত কলেজের হিসাব পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মোট ১,২১৮টি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল অনধিক ৫০০ এবং ৩২০টি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল সমধিক ১০০। অন্যদিকে, ৩৮১টি কলেজে ছাত্রসংখ্যা ১,০০০ বা ততোধিক, এবং তাদের মধ্যে ৫৩টি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,০০০ বা তারও অধিক।

১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র একই প্রকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ২২১, অথচ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিষয়ের সংখ্যা ছিল ৯৬। উত্তরবঙ্গে ১৩। ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী অনুমোদিত কলেজের হিসাবে দেখা যায় যে, ২১০টি কলেজের মধ্যে ১৩৬টি কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল অনধিক ৫০০, এবং তাদের মধ্যে ৩৪টি কলেজে অনধিক ১০০। অন্যদিকে, ২৯টি কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,০০০ বা ততোধিক, এবং তাদের মধ্যে ১১টি কলেজে ১.৫০০ বা ততোধিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদিত কলেজের সংখ্যার এবং অনুমোদিত কলেজে ছাত্রসংখ্যার তারতম্য যদি সঙ্গতি-অনুযায়ী হয়, শিক্ষার মানের হেরফের হওয়ার কথা নয়; যদিও শিক্ষাবিদদের মতে, প্রশাসনিক দৃষ্টিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা হওয়া উচিত ৫০-৬০, এবং কলেজ-প্রতি ছাত্রসংখ্যা হওয়া উচিত ৫০০-১,০০০। কিন্তু সঙ্গতির অভাব ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফল—উচ্চশিক্ষার মানের অবশ্যম্ভাবী অধোগতি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০-৮১ সালে এই বিষয়ের পরিস্থিতির উপরে ভবতোষ দত্ত কমিশন সবিশেষ আলোকপাত করেছেন।

কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৮৮টি কলেজের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৬৫টি কলেজে ১০-এর বেশি পাঠকক্ষ ছিল না। তাদের মধ্যে ১৩টিতে পাঠকক্ষ ৫-এর বেশি ছিল না। ১৯৬টি কলেজের তথ্যে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে ৪৮টি লাইব্রেরিতে একসাথে ২৫ জন-এর অধিক ছাত্রের পাঠস্থান ছিল না। কমিশনের মতে, একটি কলেজের লাইব্রেরিতে অন্তত ২৫,০০০ পুস্তক থাকা উচিত। সেই মানে, ২০১টি কলেজের মধ্যে মাত্র ৩৫টিতে পুস্তকসংখ্যা সন্তোষজনক ছিল। এমনকী, ৫৩টি কলেজের লাইব্রেরিতে পুস্তকসংখ্যা ছিল ৫,০০০-র নীচে। প্রয়োজনীয় পুস্তকসংখ্যার অভাব, লাইব্রেরিতে পাঠস্থানের অকুলান, এবং হয়তো আরও কিছু কারণে, ১৯৮টি কলেজের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৯৬টি কলেজের লাইব্রেরিতে গড়ে দৈনিক ৩০টির অধিক পুস্তক পাঠার্থে বহির্গত হত না। বিজ্ঞানাগারের চিত্র ছিল, গড়ে স্থান-পিছু ৪ বা ততোধিক ছাত্র, এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছাত্র-প্রতি স্বীকৃত মানের অধিক ব্যয় মাত্র ৮-২০টি কলেজে। ১৬৭টি কলেজের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে ৩৯টিতে কোনো ক্রীড়াঙ্গন নেই এবং যাদের আছে, তাদের মধ্যে অর্ধেকের ক্রীড়াঙ্গন আয়তনে ক্ষুদ্র। ২০৩টি কলেজের তথ্যে জানা যায় যে তাদের মধ্যে ১১৪টিতে কোনো ক্যানটিন বা হোস্টেল নেই।

কেউ-কেউ মনে করতে পারেন যে গরিব দেশে, যথেষ্টসংখ্যক পাঠকক্ষ, লাইব্রেরি-পুস্তক, বিজ্ঞানাগার, ক্রীড়াঙ্গন, ক্যানটিন, হোস্টেল ইত্যাদি সমন্বিত কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণ করা দুরূহ। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, বেসরকারি চেষ্টায় উচ্চশিক্ষার প্রসার যা হয়েছিল, তা এইভাবেই সীমিত সামর্থ্যের ভিত্তিতে হয়েছিল। এই মতের আলোচনা করার পূর্বে, উচ্চশিক্ষার আরও একটি ছবি নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্যে, শিক্ষকের স্থান নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য। সাজ-সরঞ্জামের অনটন কিছুটা সহনীয় হলেও, শিক্ষকের সংখ্যাও কি যথেষ্ট ছিল?

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বিষয়ের শিক্ষক সেই বিষয়ের প্রতিটি পত্রের পাঠ্যসূচী অধ্যয়ন করান না বা করাতে পারেন না। অতএব, ছাত্র-শিক্ষকের গড় অনুপাতের হিসাবে শিক্ষকের অনটন বোঝা যায় না। একটি শ্রেণীতে যদি ১০০ ছাত্র থাকে এবং তারা যদি ৮টি পত্র বা অর্ধপত্র অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের জন্য ৮ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক-প্রতি ছাত্রসংখ্যা এই হিসাবে ১২-১৩ হলেও, বিষয়-অনুযায়ী শিক্ষক-প্রতি ছাত্রসংখ্যা ১০০, শিক্ষকের পরিশ্রম ও মনোযোগ

সেই অনুপাতে। এই কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-সংখ্যা নির্ণয় করার সমুচিত পন্থা হল, একদিকে প্রতি শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার একটা উচ্চসীমা নির্ধারণ করে এবং অন্যদিকে বিষয়প্রতি সাপ্তাহিক পাঠদানের সময়ের একটা নিম্নসীমা নির্ধারণ করে, শিক্ষকের সহনীয় পরিশ্রম অনুযায়ী শিক্ষকসংখ্যার প্রয়োজন স্থির করা।

ভবতোষ দত্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়—১৯৮০-৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২০-৩০টি কলেজ ছিল, যেখানে বিষয়-প্রতি মাত্র একজন সর্বক্ষণের শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় অর্ধেক-সংখ্যক কলেজে বিষয়-প্রতি সর্বক্ষণের শিক্ষক দুইজনের বেশি ছিলেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে—কোনো বিষয়ে সাম্মানিক পাঠক্রম না থাকলে, বিষয়-প্রতি দুইজন শিক্ষকই যথেষ্ট, যদি শিক্ষককে সপ্তাহে ১৪টির অধিক 'পিরিয়ড' না নিতে হয়। কিন্তু শ্রেণী-প্রতি ছাত্রসংখ্যার উচ্চতম সীমা ১৫০। অতএব, কলেজের প্রতি বর্ষে এবং প্রতিটি বিষয়ে যদি একটি শ্রেণীও থাকে, তাহলে, সাম্মানিক পাঠক্রমরহিত বিষয়ে দুইজন শিক্ষকের ৬০০ পর্যন্ত ছাত্রকে পাঠদান করতে হতে পারে। গড়ে এই সংখ্যা প্রায় ৩০০ হয়। স্বভাবতই, দুইজন শিক্ষকের পক্ষে ৩০০ ছাত্রের প্রতি ছাত্রকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। অতএব, কলেজে শিক্ষকের পাঠদান পর্যায়ক্রমে বক্তৃতামালার অতিরিক্ত আর কিছু হয় না।

আমি যতদূর জানি, পশ্চিমবঙ্গের কলেজশিক্ষার এই চিত্র কোনো ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমবঙ্গেরই মতো সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক সরকারি ও মিশনারি (রামকৃষ্ণ মিশনও তো মিশন!) কলেজ বাদ দিলে, কলেজ-স্তরে উচ্চশিক্ষার হাল একই প্রকার। কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে, পশ্চিমবঙ্গের তথা সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিত্রে, দুটি স্থূল রেখা পরিস্ফুট,—ভারসাম্যহীন এবং সঙ্গতিবিহীন প্রসার।

এই প্রসঙ্গে ইতি টানার পূর্বে, স্থগিত প্রশ্নটির আলোচনা প্রয়োজন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বেসরকারি প্রয়াসে যেভাবে স্বল্প সামর্থ্যের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়েছিল, স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও সেইভাবে প্রসারের সার্থকতা আছে কি? মুখ্যত দুটি কারণে আমার মনে হয়—না। প্রথম, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল, যে যাই বলুন, প্রধানত পাশ্চাত্যে অর্জিত জ্ঞানের আহরণ। এই কারণে শিক্ষকতার লক্ষ্য ছিল সেই জ্ঞান সহজভাবে ছাত্রদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর লক্ষ্য এখন, উচ্চশিক্ষার স্ব-নির্ভরতা অর্থাৎ উন্নত দেশের সঙ্গে সমতালে জ্ঞানের অন্বেষণ। দ্বিতীয়, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের ফলে উচ্চশিক্ষার্থীর অধিকাংশ এখন সমাজের পূর্বতন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত পরিবার-বর্গের সন্তান-সন্ততি, যাদের জন্য উন্নততর ব্যবস্থার প্রয়োজন। দুটি কারণেই, পুরাতন স্বল্প-সামর্থ্যভিত্তিক উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের প্রবঞ্চনা করার শামিল। এমনকী, শিক্ষাদানও সমষ্টির সাথে-সাথে ছাত্র-বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া দরকার। সোজা কথায়, সার্থক উচ্চশিক্ষার জন্য এখন অনেক বেশি মূলধন প্রয়োজন। শিক্ষকও সমাজের মূলধন, এবং উচ্চশিক্ষা-দান করার যোগ্য শিক্ষক মহার্ঘ মূলধন। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সাথে-সাথে দেশ যদি প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দিতে না পারে, উচ্চশিক্ষায় কালোপযোগী এবং দেশোপযোগী মানের অবনতি অবধারিত।

দুই

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসন ছিল প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক। সরকারি আইনের অধীন হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালনার রাশ ধরে রাখতেন হয় কোনো গোষ্ঠী বা কোনো পরিবার। সরকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক অনুদান দিতেন এবং উপাচার্য নিয়োগ এবং পরিচালক সমিতিতে কিছু মনোনয়নের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ রাখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্বাচন, কর্মচারী-নিয়োগ, কলেজের অনুমোদন, পরীক্ষা-পরিচালনা, পাঠ্য বিষয়ের নির্বাচন এবং পাঠক্রম-নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে, কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা পরিবার অনুগ্রহ-বিতরণের দৌলতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন এবং তা কায়েম করতেন।

অনুমোদিত বেসরকারি কলেজগুলিতে উল্লেখযোগ্য দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদে, এই সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন আরও প্রকট ছিল। সরকারি কর্তৃত্বের কোনো প্রশ্ন ছিল না, কারণ সরকার কোনো বাৎসরিক অনুদান দিতেন না। কলেজের অনুমোদন লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী অংশের আনুগত্য-স্বীকারই যথেষ্ট ছিল। অন্যদিকে, কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জমি, বাড়ি এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের সঙ্কুলান করা সাধারণের সাধ্যাতিরিক্ত হওয়ায়, বিত্তশালী পরিবারবর্গই সাধারণত কলেজ প্রতিষ্ঠা করতেন। প্রতিষ্ঠাতা-পরিবার হওয়ার সুবাদে তাঁরাই কলেজ-পরিচালনা কমিটিতে পুরুষানুক্রমে কর্তৃত্ব করতেন। অনেক কলেজের জমি-বাড়ি ইত্যাদির মালিকানা-স্বত্ব হয় পরিবারের দখলে, না হয় পারিবারিক ট্রাস্টের দখলে থাকায়, প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারদের ক্ষমতাচ্যুত করার কোনো প্রশ্ন উঠত না। শিক্ষক ও কর্মচারীদের চাকুরির নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধা প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারের করুণা-নির্ভর ছিল। কখনও-কখনও অযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হত। কলেজের উদ্বৃত্ত আয় নানা কৌশলে পরিবার বা ট্রাস্টের করতলগত হত। সামন্ততান্ত্রিক শোষণও চালু ছিল। অস্থায়ী অধ্যাপকদের গ্রীষ্মাবকাশের মাহিনা দেওয়া হত না। অশিক্ষক কর্মচারীরা গৃহকর্মে সাহায্য করতেন। পরিবারের অনেক ব্যয়ই কলেজের খাতায় লেখা হত। ছাত্রদের দৃষ্টি তখন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে। যারা কলেজে ভরতি হত, তারা পড়াশোনা করার জন্যই আসত। অতএব, ছাত্রসমাজ তখন নিজেদের পড়াশোনাতেই ব্যস্ত থাকত, এবং কেউ-কেউ স্বাধীনতা-আন্দোলনে জড়িত হত। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ব্যাপারে ছাত্ররা জড়িত হত না। বরং তারা প্রতিষ্ঠাতাদের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধের প্রতীক হিসাবে দেখত।

উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনার এই সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র সত্ত্বেও, উচ্চশিক্ষার মান যে বহুলাংশে বজায় ছিল, তার কারণ অধিকাংশ পরিচালকগোষ্ঠী এবং পরিবারবর্গ উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে আন্তরিক ছিলেন। শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য এবং সুনাম অর্জন করার জন্য কলেজগুলি মেধাবী ছাত্র এবং কৃতী শিক্ষকদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিত। কলেজগুলির মধ্যে এই ব্যাপারে রীতিমতো প্রতিযোগিতা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে এই পথের পথিক ছিল, সেটা জানা কথা।

স্বাধীনতা অর্জনের পরেও বেশ কিছুকাল উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসনের চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন প্রথম শুরু করেন শিক্ষকেরা। অবশ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বেই, ত্রিশের দশকের শেষ থেকেই ছাত্ররা তাদের নিজেদের সংগঠন অর্থাৎ ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করার জন্য আন্দোলনে নামে, প্রধানত বামপন্থী ছাত্রনেতৃত্বে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসনে তারা কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করত। ষাটের দশকে, কর্মচারীরা তাঁদের দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু, নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য কোনো প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁরাও জড়িত হতেন না। পরিচালক সমিতিকে তাঁরা নিয়োগকর্তা মালিক হিসাবেই গণ্য করতেন, এবং পরিচালকদের প্রশাসনিক

অধিকার নীতিগতভাবে মেনে নিতেন। শিক্ষকেরাই প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেন আর্থিক দাবিদাওয়া আদায় এবং প্রশাসন গণতন্ত্রীকরণের জন্য। পরিচালক কমিটিতে শিক্ষকদের প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত করার রেওয়াজ চালু থাকায়, আন্দোলন সহজেই গড়ে ওঠে। কলেজে-কলেজে শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করে—যাঁরা সহজেই বিজয়ী হন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, পরিচালক সমিতির সভায় শিক্ষকদের আর্থিক দাবি পেশ করা এবং গোষ্ঠীতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রের সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকসমিতির নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলায় সহায়তা করেন। পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার এই তিনটি অংশের আন্দোলন প্রায়শই পারস্পরিক সহযোগিতা পেত। শ্লোগান ছিল—'শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্র-ঐক্য জিন্দাবাদ।'

উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা গণতন্ত্রীকরণের জন্য, অন্তত শিক্ষকদের মতের গুরুত্ব স্বীকার করার জন্য, অন্যান্য মহল থেকেও চাপ আসে। ১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা গণতান্ত্রিক এবং অর্থবহ করার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে (কোর্ট) শিক্ষকদের, ছাত্রদের এবং প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করেন। পরিচালক সমিতিতে (সিনডিকেট) শিক্ষকদের প্রতিনিধি রাখার উপরও গুরুত্ব দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯৬৬ সালে যে নতুন আইন হয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো, কলেজের শিক্ষকদেরও সিনেটে এবং অ্যাকাডেমিক কাউনসিলে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার দেওয়া হয়। সিনডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী হয়। এই ব্যাপারে, শিক্ষক-আন্দোলন এবং শিক্ষক-সমিতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জোয়ার তার পরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৭১ সালে গজেন্দ্র গদকর কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনা বিষয়ে আরও অনেক সুপারিশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিয়োজিত গণি কমিটিও সেই সুপারিশগুলি প্রধানত সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন। তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১৯৭৯ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করেন, সেটা বর্তমানে চালু। এই আইনে, সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-স্তরের শিক্ষকদের প্রত্যেকের সভ্য হবার অধিকার সংকোচন করে, কলেজ-শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধিসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

বামফ্রন্ট সরকার দাবি করেন যে, ১৯৭৯ সালের আইন প্রণয়ন করে তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের যথোচিত গণতন্ত্রীকরণ করেছেন। কারণ এই আইনবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতেও, ছাত্র ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি আছে এবং কলেজ-শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধিসংখ্যার আপেক্ষিক বৃদ্ধি হয়েছে। বামফ্রন্ট-সমর্থক শিক্ষক-নেতাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দের প্রাধান্য থাকলে, তা সুস্থ গণতন্ত্র হবে না। তার জন্য প্রয়োজন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control)। সমাজের বিভিন্ন অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলে, সেই প্রশাসনই হবে সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রশাসন। কলেজের পরিচালনা সমিতিরও এই আদলে পরিবর্তন করা হয়েছে। সারা দেশে, গজেন্দ্র গদকর কমিটির সুপারিশের কল্যাণে এবং শিক্ষক-আন্দোলনের চাপে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রশাসনের কমবেশি একই রকম পরিবর্তন হয়েছে। মহারাষ্ট্রের একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পরে উল্লেখ করব।

আমাদের আলোচ্য বিষয় শিক্ষার মানের উপর গণতন্ত্রীকরণের প্রভাব। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনায় অধুনা যে ধরনের গণতন্ত্র চালু হয়েছে, তার ফলে শিক্ষার মানের অবনতি হওয়ার সম্পর্ক আছে কি? গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে শিক্ষার মানের কোনো বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় গণতন্ত্র রূপায়িত করার কর্ণধার যদি এমন ছাত্রেরা হন, যাঁদের মূল লক্ষ্য ডিগ্রী পাওয়া—জ্ঞান আহরণ নয়—যদি এমন কর্মচারীরা হন, যাঁদের মূল লক্ষ্য চাকুরির সুযোগ-সুবিধা আদায় করা—ছাত্র ও শিক্ষক-দের পরিষেবা করা নয়—যদি এমন শিক্ষকেরা হন, যাঁদের মূল লক্ষ্য সংঘশক্তির জোরে নিজেদের পেশাগত উন্নতি করা,—জ্ঞান-অন্বেষণ বা জ্ঞানজগতে ছাত্রদের পথপ্রদর্শন করা নয়—এবং 'সামাজিক নেতৃত্বের' মূল লক্ষ্য যদি হয়, যেনতেনপ্রকারেণ নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনপ্রিয় করা এবং সুদৃঢ় করা, তাহলে শিক্ষার মানের বলিদান অবশ্যম্ভাবী।

'সামাজিক নেতৃত্ব' কখনই বলে না যে সবাই উচ্চশিক্ষার যোগ্য নয়। বলে না যে সস্তায় উচ্চশিক্ষা হয় না এবং উচিত মানের উচ্চশিক্ষাদানের সঙ্গতি না থাকায় সবাইকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া যায় না। বরং, শিক্ষাবিস্তারের নামে তারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ, এবং বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রসংখ্যা, বৃদ্ধি করেই চলেছেন। কিন্তু ছাত্রদের তো ডিগ্রী চাই। অতএব, বিপুলসংখ্যক অযোগ্য এবং অপ্রস্তুত ছাত্রদের ডিগ্রী দিতে হলে, পরীক্ষার মানকে নামাতেই হয়।

এই 'মহৎ' উদ্দেশ্যে, নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার নম্বরে 'গ্রেস' দেওয়া, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর 'রিভিউ' করা ইত্যাদি চিরাচরিত পদ্ধতি তো আছেই। এগুলির নিয়মকানুন কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা হয় না, এমনভাবে করা হয় যাতে ছাত্রেরা 'উপকৃত' হয়। যেন, উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছাত্রদের 'উপকার' করা, অর্থাৎ ডিগ্রী দেওয়া। গত কয়েক বৎসর যাবৎ আরও একটি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। দাবি উঠেছিল, কলেজের পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রকার এবং প্রধান পরীক্ষক কলেজ শিক্ষকদেরই হওয়া উচিত, কারণ তাঁরাই জানেন যে কলেজে কী স্তরে পড়ানো হয়। অর্থাৎ, তাঁরাই তাঁদের মান স্থির করবেন। ফলে, সাম্মানিক পরীক্ষাতেও অভূতপূর্ব সাফল্য। মহারাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত এখন উল্লেখ করি। সেখানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিষয়ে বোর্ড অভ স্টাডিজ একটিই, যাতে প্রাক-স্নাতক শিক্ষকদেরই সংখ্যাধিক্য। অর্থাৎ, স্নাতকোত্তর শিক্ষাতেও তাঁদের মতামতই শেষ কথা। সেই ক্ষমতা তাঁরা সচরাচর প্রয়োগ করেননা, এইযারক্ষা। পশ্চিমবঙ্গে, 'আবশ্যিক-ঐচ্ছিক' নিয়ম চালু করে, ভাষা-শিক্ষার পাট তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করার চেষ্টা করেছিলেন। 'সামাজিক নেতৃত্ব' ধমকে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যবস্থা আরও চমৎকার। শিক্ষকেরা ক্লাসে যা পড়ান বা নোট দেন, সেটাই পরীক্ষার চৌহদ্দি, পাঠ্যপুস্তক নয়। শিক্ষকেরাই প্রশ্ন করেন এবং পরীক্ষাপত্রের মূল্যায়ন করেন। যদি বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো বিভাগে প্রশ্নপত্রের রচয়িতা অন্য কেউ হন, 'মডারেশনে'র সময় প্রশ্নপত্র এমনভাবে সংশোধন করা হয় যাতে ছাত্রেরা ক্লাসের পড়া থেকে আবশ্যিক-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর করতে পারে। ছাত্রদের 'সুবিধার্থে', স্নাতকোত্তর পরীক্ষা সপ্তাহে দুটির বেশি পত্র করা হয় না। অর্থাৎ, ছাত্রেরা নতুন করে কণ্ঠস্থ করার জন্য যাতে তিন-চারদিন সময় পায়।

এত সব সুবিধা সত্ত্বেও, শেষরক্ষা কিন্তু হচ্ছে না। প্রাক্-স্নাতক পরীক্ষায় সাফল্যের হার গড়ে শতকরা ৫০-৬০। অর্থাৎ, প্রায় অর্ধেক ছাত্র এই নিম্নমানেরও অযোগ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অর্ধেক অপচয় হচ্ছে। সাম্মানিক পরীক্ষায় এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সাফল্যের হার যে অলীক, সেটা যে-কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা 'ইনটার-ভিউ'তেই বোঝা যায়। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে।

বিশেষত, আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের মান বিশ্বের যে-কোনো দেশের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু, শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য বা মান বিচার করতে হলে, সাধারণ বা গড় ছাত্রের মানই বিচার্য। সেই বিচারে, সাধারণ গ্র্যাজুয়েটের মান আজ নিশ্চয়ই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের গ্র্যাজুয়েটের মানের অনেক নীচে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—শিক্ষকসমাজ এবং 'সামাজিক নেতৃত্ব' উচ্চশিক্ষার এই অবস্থা মেনে নিচ্ছেন কেন? তাঁরা কি উচ্চশিক্ষার এই হাল জানেন না, বা স্বীকার করেন না? আমার দৃঢ় ধারণা—তাঁরা পরিষ্কার জানেন, এবং চিন্তিতও। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যের সাথে দলীয় প্রাধান্যের উদ্দেশ্য জড়িত হয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষার প্রশাসনে গণতন্ত্রই যথেষ্ট নয়, 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ'ও প্রয়োজন, অন্যার্থ 'দলীয় নিয়ন্ত্রণ'ও প্রয়োজন। দলীয় নিয়ন্ত্রণের চাবি-কাঠি দলীয় সংগঠন। অতএব, উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পথে "সুপরিচালিত" করতে হলে দলীয় সংগঠনের প্রাধান্য অপরিহার্য। উচ্চশিক্ষার প্রায় সর্বপ্রকার কার্যক্রম এখন এই চক্রে আবর্তিত হচ্ছে।

দলীয় ছাত্রসংগঠন শক্তিশালী করতে সমমনোভাবাপন্ন ছাত্রদের ভরতির সুযোগ দেওয়া, হোস্টেলে স্থানের ব্যবস্থা করা, ইউনিয়ন নির্বাচনে সুযোগ আদায় করা ইত্যাদি এখন ছাত্রনেতাদের স্বীকৃত কার্যক্রম। ছাত্রনেতাদের এই ধরনের কাজ-কর্মে, সমমনোভাবাপন্ন প্রশাসন, শিক্ষক ও কর্মচারী-দের সাহায্য পাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সংগঠনের শক্তির পরিচায়ক যেহেতু সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এইসব কাজে অবহেলার বস্তু। কর্মচারীদের সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধি করতে এবং অটুট রাখতে হলে, ফাঁকিবাজি, অসততা, অক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্ন চাপা রাখতে হয়, নিয়োগে এবং নেতৃত্বে যোগ্যতার বিচার হয় "সংগ্রামী" চেতনা এবং চরিত্রের মাপকাঠিতে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। সর্বোপরি, সামাজিক নেতৃত্ব শক্তিশালী করার জন্য গণ-টোকাটুকি বন্ধ করাই যথেষ্ট মনে হয় না, ছাত্র-সমাজ তথা সমাজে উচ্চশিক্ষার 'আগ্রহ' তুষ্ট করার জন্যে পাঠক্রম ও পরীক্ষার মান নানা পদ্ধতিতে খর্ব করা হয়।

বলা প্রয়োজন যে উচ্চশিক্ষায় গণতন্ত্রকে দলীয় শাসনের অধীনে রাখার এই প্রচেষ্টায় কোনো রাজনৈতিক দল কম যায় না। যে দলের যা আদর্শই থাক, শাসকদলই হোক বা বিরোধী দলই হোক, সারা দেশেই আজ এই চিত্র। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন, কর্মচারী সংগঠন এবং শিক্ষকসমিতির নির্বাচনে, সব রঙের দলই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে দলীয় মুখপত্রে কর্মীদের দিনের পর দিন নির্দেশ দেওয়া হয় সম্ভাব্য ভোট-দাতাদের তালিকাভুক্ত করতে। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা এখন রাজনৈতিক ব্যবস্থারই একটি অঙ্গ। কিন্তু উচ্চশিক্ষার মানের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। রাজনীতি তার নির্ধারক নয়।

তিন

যাঁরা মনে করেন উচ্চশিক্ষার রাষ্ট্রীয় অর্থ-নির্ভরতাই তার মানের অবনতির মূলে, তাঁদের যুক্তি কী? গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে, রাজনৈতিক দলই শাসনের অধিকার পায়, সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে। উচ্চশিক্ষা যদি রাষ্ট্রের অর্থে চলে, তাহলে রাষ্ট্রযন্ত্র মারফত দলীয় শাসন অবশ্যম্ভাবী। এবং দলীয় শাসন উচ্চশিক্ষায় রাজনীতির অনুপ্রবেশের সহায়ক। এই যুক্তিকে অকাট্য সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক এবং শিক্ষাব্যবস্থার আর্থিক মেরুদণ্ড। তথাপি, রাজনৈতিক দলগুলি সেসব দেশে উচ্চ-শিক্ষার প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে না। আমাদের দেশে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কিভাবে উচ্চশিক্ষার মানে আঘাত

হানছে, তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার, তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' বা স্বায়ত্তশাসন একটি স্বীকৃত নীতি। কারণ, উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য জ্ঞানের অন্বেষণ এবং প্রসারণ। কোনো কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনার কারণে, বিশ্ববিদ্যালয় সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। হলে, সমাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি কি সত্যিই স্ব-শাসিত?

স্ব-শাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ—বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই নিজের উপাচার্য, অর্থাৎ প্রধান কর্মকর্তা, নির্বাচন করে কি না? আমাদের দেশে, প্রার্থী-তালিকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়, নিয়োগকর্তা হচ্ছেন রাজ্যপাল রাজ্যবিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি সাধারণত মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ করেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। প্রশ্ন এই যে, মন্ত্রীর পরামর্শ বা অনু-মোদনের প্রয়োজন কেন? উপাচার্যের পদ কি সরকারি পদ, না রাজনৈতিক পদ? কোনো রাজ-নৈতিক দলই পরিষ্কার ভাষায় সে কথা বলবেন না। আসলে, কোনো শাসকদলই চান না যে তাঁদের পছন্দের বিরুদ্ধে উপাচার্য নিযুক্ত হন। আর শাসকদলের পছন্দ এবং অনুগ্রহে নিযুক্ত উপাচার্য স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন, এটা কি আশা করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেবার ক্ষমতা বিধানসভা বা লোকসভার আইন-নির্ভর বলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সরকার-নির্ভর বলে, বিশ্ববিদ্যালয় কখনই স্বাধীন-ভাবে নিজের উপাচার্য নিযুক্ত করতে পারে না। রাষ্ট্র বা সরকারের পছন্দের বিরুদ্ধে উপাচার্য নিযুক্ত হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়, পশ্চিমবঙ্গবাসী-দের সে অভিজ্ঞতা এখনও পুরাতন হয় নি। দেশের অন্য কিছু রাজ্যের অধিবাসীদেরও সে অভিজ্ঞতা আছে, যদিও তীব্রতায় কম। শাসক দল কী কারণে নিজেদের পছন্দমতো উপাচার্য চান? উপাচার্য তো তাঁদের নির্বাচনী বৈতরণী পার করাবেন না। কারণ, তাঁরা চান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের যে দল আছে, তাদের কাজকর্মে তিনি যেন কোনো বাধা না দেন। সেই কাজকর্ম কিভাবে শিক্ষার মানের ক্ষতি করে, পূর্বেই আলোচনা করেছি। রাষ্ট্র-নির্ভরতা এইভাবেই সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছে।

উপাচার্যের নিয়োগই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একমাত্র ক্ষেত্র নয়। আর্থিক অনুদানের ক্ষমতার জোরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনক্রম কী হবে, কোন্ স্তরে কটি পদ থাকবে, সে ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্বাধীনতা নেই। এমনকী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনেও (স্ট্যাটুট) রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ফলে, মন্ত্রীর মাধ্যমে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়।

সরকারি অনুদানের আরও একটি সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক ফল আছে। সরকারি প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, উদ্যোগের অভাব। পক্ষপাতিত্বের অভি-যোগের ভয়ে, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিতে পরাঙ্মুখ। ফলে, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। নিলেও, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সরকার যখন অনুদান দেয়, তার শর্তগুলিও এই সূত্রে গ্রথিত থাকে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যই হল মূল্যায়ন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করে দেয় কে প্রথম শ্রেণী পাবে, কে দ্বিতীয় শ্রেণী, আর কেই বা 'ফেল'। কে কত নম্বর পাবে? কে প্রথম, কে তার পরে—বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষান্তে তা স্থির করে দেয়। অথচ, যাঁরা সেই মূল্যায়ন করবেন, তাঁদের মূল্যায়ন করা অসম্ভব, যদি সরকারি অনুদানের শর্ত পালন করতে হয়। শিক্ষক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা যে কলেজেই নিযুক্ত হন না কেন, বেতন প্রতিস্তরে সর্বত্র সমান, বেতনের বৃদ্ধিও সমহারে। এমনকী পদোন্নতির নীতিও প্রায় সর্বক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বা উৎকর্ষের স্বীকৃতি পাবার সুযোগ বিরল।

অন্যদিকে, এইসব না থাকলেও, কালের নিয়মে বেতন-বৃদ্ধি ও পদোন্নতি নিশ্চিত। শিক্ষকদের সংগঠনও এই ব্যবস্থায় পরম আনন্দিত, কারণ তাহলে নাকি কর্তৃপক্ষের 'অবিচার' করার সুযোগ সীমিত হয়। ফলে, অবশ্য, কৃতিত্ব বা উৎকর্ষের জন্য শিক্ষকদের প্রচেষ্টা অন্তর্হিত। উচ্চশিক্ষার প্রশাসন অধুনা তাই সরকারি প্রশাসনের সমতুল্য হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ আরও কিছু সূক্ষ্ম কুফলের কারণ হয়েছে। প্রথম, মামলাবাজি। আমাদের সংবিধানে প্রতি নাগরিককে কিছু মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে, যা হরণের অভিযোগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যায়। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের অর্থ-নির্ভর হওয়ার কারণে, আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলেই বিবেচিত হয়। অতএব, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে মৌলিক অধিকার হরণের অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকী, ছাত্র-দের ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়েও কোর্ট-কাছারি হয়। আমাদের দেশে মকদ্দমার সিদ্ধান্ত হতে দেরি হয়—জানা কথা। ইতিমধ্যে, প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। প্রশ্নটা অবিচারের নয়। রাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাইরে দেশের যে বিপুল অংশ আছে, সেখানে অবিচারের প্রশ্ন যেভাবে মীমাংসিত হয়, শিক্ষাব্যবস্থায়ই বা তার ব্যতিক্রম হওয়ার বিশেষ যুক্তি কিছু আছে কি?

দ্বিতীয়, শিক্ষকসমাজের পেশাগত আনুগত্য। সমাজ আশা করে যে শিক্ষকেরা তাঁদের কর্মজীবনের সর্বক্ষণ শিক্ষার কার্যেই ব্যয় করবেন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্বে, শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারি ক্ষেত্রে, কোনো-কোনো শিক্ষক স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করতেন। সেই সময়টাকে একটি বিশেষ অবস্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে, যদিও অনেক শিক্ষাবিদ তাও সমর্থন করতেন না। কিন্তু গত তিন দশক যাবৎ, শিক্ষককুলের বড়ো একটা অংশ রাজ-নৈতিক কাজকর্মকে তাঁদের পেশার অঙ্গ করে নিয়েছেন। চিত্রটা এখন আর পেশাগত দায়িত্ব সম্পাদন করে অবসর সময়ে রাজনীতি করা নয়, বরং বিপরীত। রাষ্ট্রের উৎসাহে এই কাজ এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মজার কথা, সরকারি অর্থে বেতনভুক হলেও, আইন করে বলা হচ্ছে যে তাঁদের চাকরি সরকারি চাকরির তুল্য বলে গণ্য হবে না। ফলে, শিক্ষকেরা এখন লোকসভা ও বিধানসভার সভ্য হচ্ছেন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত ইত্যাদির নির্বাহী সভ্য হচ্ছেন, এবং দুই সংস্থা থেকেই অর্থাগম করছেন। এমনকী, কেউ-কেউ এক টাকা বেতন গ্রহণের কৌশলে দুটি সর্বক্ষণের চাকরি করেছেন। প্রশ্নটা বেতন বা ভাতার নয়। প্রশ্নটা এই যে, এইজাতীয় শিক্ষকেরা কি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় পান? নিজ কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক দায়িত্বে যোগ দেওয়া স্বায়ত্তশাসনেরই অঙ্গ। কিন্তু সারাদেশের সাথে সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করাটাও যদি শিক্ষকের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়, তাহলে 'সর্বক্ষণে'র শিক্ষক কথাটার অর্থ কী?

তৃতীয়, আমার মতে যেটা বোধহয় সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশাসকদের চারিত্রিক মেরুদণ্ড হীনবল হয়ে যাচ্ছে। সদ্যোনিযুক্ত শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে উপাচার্য পর্যন্ত আজ রাজ-কর্মচারীদের দ্বারস্থ হন, প্রসাদসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অ্যাকাডেমিক আলোচনা-সভাতেও উদ্বোধনী বক্তৃতার জন্য মন্ত্রী বা রাজপুরুষদের আনয়নকে সাফল্য গণ্য করা হয়। দূরচেতা, স্পষ্টবাদী এবং নির্ভীক বলে যাঁদের পরিচিতি ছিল, তাঁরা আজ কোথায়? শিক্ষক-গবেষক-প্রশাসক হিসাবে নিজ সমাজের স্বীকৃতি অর্জনের পরিবর্তে, সরকারি আনুকূল্যে শীর্ষে ওঠার জন্য তাঁদের আজ উদগ্র ব্যস্ততা।

চার

ভারসাম্যহীন সঙ্গতিবিহীন প্রসার, দলীয় রাজ-নীতির অনুপ্রবেশ এবং সরকারি আধিপত্য—ভারতের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার যে তিনটি প্রধান সমস্যার কথা আলোচনা করা হল, তা থেকে উচ্চশিক্ষাকে মুক্ত করার কোনো উপায় এবং সম্ভাবনা আছে কি? গত চল্লিশ বছরে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে অনেক কমিশন ও কমিটি এইসব ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। বিশেষ কিছুই করা যায় নি। সাম্প্রতিক কালে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে যে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের রিপোর্ট ১৯৮৪ সালে পেশ করা হলেও, আজও পর্যন্ত সরকার সে বিষয়ে তাঁদের মতামত স্থির করেন নি। শোনা যায়, কমিশনের অনেক সুপারিশ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে গ্রহণ-যোগ্য নয়। সমস্যাটা এইখানেই। সমস্যা সমাধানের অনেক অ্যাকাডেমিক উপায় আছে, কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছার (political will) অভাব। অতএব, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশের উল্লেখ করে এই প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি করা নিরর্থক। মনে হয়, উচ্চ-শিক্ষাব্যবস্থা এইভাবেই চলবে, কোনো গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা অবাস্তব।

ক্ষতি কার? ক্ষতিটা জাতির ভবিষ্যতের। পৃথিবীর সমস্ত দেশের বি. এ./ এম. এ./ ডক্টরেটদের মান যে একই স্তরের হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের মান না হয় আমরাই ভোট দিয়ে স্থির করলাম। কিন্তু, আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রতিভাবান, যারা ভবিষ্যতে দেশকে বিভিন্ন কার্য-কলাপে আত্মনির্ভর রাখবে, তাদের মান তো ভোট দিয়ে স্থির করলে চলবে না, তাদের যে বিশ্বের দরবারে প্রতিযোগিতা করতে হবে। আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা তাদের বাছাই করে সযত্নে পালন করার পরিবর্তে, ছাত্রসমুদ্রে তাদের বিলীন করে দিচ্ছে। সাধারণ চাষীও বীজধানের গুরুত্ব বোঝে, আমরা সমাজের বীজধানরক্ষায় নিস্পৃহ।

দিগন্ত বিষাদ

সুকুমার চৌধুরী

বৃষ্টি এক আশ্চর্য বিষাদ, তার দীর্ঘশ্বাস শোনো,
দেখো অশ্রুপাত
অঝোর ধারায় তার স্নান করে রমণীরা
ধুয়ে ফেলে সুখস্বেদ, শরীরের অজস্র বিষাদ
বন্যাহীন এমন কান্নার দিনে
মানুষ কৃষির কথা ভাবে
বৃষ্টিধোওয়া চোখে দেখে সোনালি ধানের শীশ
সন্ততির হাসিগান আর ব্যক্তিসুখ

কে আর বৃষ্টির কথা ভাবে
বোঝে তার দিগন্ত বিষাদ
নিজস্ব অশ্রুর স্বাদে দিন যায় মানুষের
এভাবেই শেষ হয় সবকিছু
ধূসরতা নেমে আসে রুখুশুখু চুলে
আর মানুষের যাপনবিভায়

মানুষ পারে না
আসলে বৃষ্টির বিষাদে কাঁদে গাছ
ভিজে ওঠে সমব্যথী মাটি আর
বাতাস বহন করে তার ধ্বনি, গূঢ় দুঃখবোধ

ওদিকে সমূহ জুড়ে জেগে থাকে

সন্তোষকুমার মাজী

শরীরের বারান্দায় সময়ের লুকোচুরি খেলা
ওদিকে প্রকৃতি জুড়ে দিনভোর আলোছায়া, বাতাস, বেলুন ;
পাহাড় ডিঙিয়ে যায় ভাবনার স্রোত, বিনিদ্র আকাশে
পেঁজা তুলো, যেন উড়ে যায় দুঃখের কবিতা
শত উপলব্ধি খঞ্জনি বাজিয়ে যায় আলোর কৌতুকে

রিমঝিম বৃষ্টি শুনে কখনও বা জানালার কাছে যাই
ঘাই মারে অস্থিমজ্জা, বিদ্যুৎকণিকা দোলে রক্তের ভিতর
ভারাক্রান্ত বোধ শূন্যভূমি জুড়ে আছড়ায়, ভাঙে
বৃষ্টির আতর মেখে সহস্র যন্ত্রণাজাল ছিঁড়ে যায়

নিবিড় মায়ায় রক্তপথের শুধু শুষে নেয় ঘোর ক্লান্তি
বয়সের উদ্বেল ভেঙে অনুভবগুলো চাঙা হয়ে উঠে
শব্দমন্ত্রজালে জেগে উঠে কবিতার অমোঘ ভাস্কর্য
ওদিকে সমূহ জুড়ে জেগে থাকে রক্তবর্ণ গোধূলির ফুল !

নারী

মীনাক্ষী ঘোষ

বাসবদত্তা, কৃষ্ণকলি এমনকী বনলতাকেও
পার করে পৌঁছেছি সমুদ্রকিনারে।
এবার কোন্ নামে তুমি বিশ্বসুন্দরী
ডায়াসে দাঁড়াবে?
রেটিনার তীর ঘিরে হরিণীর পল্লব নেই;
দৃষ্টি তো পাখিদের নীড়ও আর নয়;
ডিসকো-র অস্থির ঝাপটানো রোদে
মরীচিকা অচেনায় কেবলই হারিয়ে যাও।
কী নামে ডাকব তোমায়?

শৃগাল-কোরান কিংবা দরবারি কানাড়া
নাম তো রাত্রিই তার।
এই বিশ্বাসে রুখেছি নাগরদোলা।
ঘূর্ণির জ্বর থেকে দিঘি হয়ে যাও নারী
স্থির, সুগভীর; এই প্রার্থনা।

জাদুকরী জাদুদণ্ড ভুলে এসেছ কি?
আকাঙ্ক্ষার দিব্য রামধনু
ঢেকেছে ডিসকো-র মাসকারা।
পৃথিবী চাতক ঠোঁটে মেলেছে অপেক্ষা তার
একফোঁটা স্বর্গের জল চাই শুধু।

বিভূতিভূষণ

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

ফোঁটা-ফোঁটা উত্তাপের রসদ জমেছে
মৌচাকে যেমন জমে ঘন পুষ্পসার
ইঁদুরের মতো ধৈর্যে কণা-কণা ভরে ওঠা
শস্যের মজুতদারি কৃপণের ঘরে।

সুখী ফানুসের মুখ আলগা অন্ধকারে
মৎস্যচক্ষু ভেসে যায় অনীহ হাওয়ায়
যন্ত্রণার স্থির কেন্দ্রে জমে ওঠে দহনের তাপ
ভিতরে বাইরে জমে মাংসপোড়া ছাই

চেনে নি কখনো মুখ বিস্রস্ত পৃথিবী
পরিচয় জ্বলে গেছে কঠিন দহনে
সময় কামড়ে নিলে প্রিয় পরিচিত কোমলতা
আধখাওয়া মুখ দেখে শিউরেছে হাওয়া

গোটা জীবনের ছাই লেপে যায় মুখে
পোড়াগন্ধ যত্নে ঢাকা শুভ্র বিভূতিতে
আজন্ম দহনে স্তব্ধ অবশেষে স্বচ্ছতা ভুলেছে
সৌজন্যের আল বাঁধি যূথচর প্রাণী

একটু বসার জায়গা

মিহির ভট্টাচার্য

একেবারে শেষ মুহূর্তে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল অনির্বাণ। লোকালটা আরেকটু হলেই সে ধরতে পারত না। কাছাকাছি কামরাগুলো সব ঠাসাঠাসি ভরতি। ও দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে মাঝামাঝি একটা কামরায় ওঠার মতো জায়গা পেল। দরজার মুখে জটলা। ওর সামনে লাঠি-হাতে এক থুথুরে বুড়ো ওঠার চেষ্টা করছেন। জটলার মধ্য থেকে এক যুবক সামান্য সরে একটু জায়গা দিতে বুড়ো মানুষটি কোনোরকমে উঠতে পারলেন। সেই ফাঁকে অনির্বাণও তাঁর পেছন-পেছন কামরায় উঠে পড়ল। সমস্যা তার পরে। বুড়ো আর এগোতে পারছেন না। দু-একজনকে কাটিয়ে যেতে পারলে একটু ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে। অনির্বাণ বেঁকে-চুরে, বুড়োকে বাঁচিয়ে তাঁর সামনে চলে গেল। মুখে যথাসম্ভব অমায়িক ভাব ফুটিয়ে বলল—'দাদা, বুড়ো মানুষ! ও পাশটায় যদি একটু দাঁড়াতে দেন!'

কামরার মধ্যেকার লোকেরা যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছে। কেউ-ই নিজ-নিজ অবস্থান থেকে নড়তে-চড়তে চায় না। এখানেও দুটি যুবক একটু কাত হয়ে যে জায়গাটুকু দিল তাতে অনির্বাণ বুড়োকে নিয়ে পূর্বাঞ্ছিত স্থানে এসে দাঁড়াল। ও বুড়োর কাছে অপরিচিত হলেও তিনি এখন নিজেকে ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর হাতে লাঠি ছাড়া আর কোনো অবলম্বন নেই। বুড়োর মাথার চার-ধারে কোঁকড়ানো সাদা চুল। মাঝখানে বিরাট টাক। বলিকুঞ্চনে সমস্ত মুখটা নদীবহুল ভূপ্রকৃতি। চোখের ভুরু সাদা। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্য চোখের পাতা কোঁচকানো। পরনে হাফহাতা পানজাবি, হাঁটুর কাছাকাছি ওঠা ধুতি। পায়ে সাদা কাপড়ের জুতো। হাত-পায়ের অনাবৃত অংশের লোম সাদা। শিরাগুলো সুপরিস্ফুট। ওর ওপর বুড়োর নির্ভরতা আর তাঁকে যত্ন করে দাঁড় করাতে ওর ব্যস্ততা দেখে কামরার লোকগুলো ওদের দুজনকে পরস্পরের আপনজন বলে ভেবে নিয়েছে। ততক্ষণে ট্রেনটা

স্টেশন ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে পড়েছে। প্রকৃতির আলো আর হাওয়া ঢুকে পড়ছে কামরার মধ্যে।

ওই বুড়োকে নিয়ে অনির্বাণ কামরার যে জায়গাটায় এসে দাঁড়াল সেখান থেকে ভেতরের প্যাসেজটা একটা ক্রশের মতো দেখাচ্ছে। দুপাশে এক দরজা থেকে আরেক দরজা পর্যন্ত তার চওড়া ছোটো অংশ আর কামরার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত প্রসারিত তার লম্বা সরু দণ্ড। দুপাশের সিটে লোক বসে আছে। প্যাসেজের সরু অংশেও লোক দাঁড়িয়ে।

স্বস্তিতে দাঁড়াতে পেরে অনির্বাণ পুরো কামরার লোকগুলোকে মন দিয়ে লক্ষ করল। পুরো কামরাটা আশ্চর্যজনকভাবে সুখী লোকে ভরতি। জামাকাপড়ে ইতরবিশেষ হলেও, চেহারায় নাগরিক অর্ধ-নাগরিক ও গ্রাম্য ছাপ থাকলেও তাদের স্বাস্থ্য, মুখ, চোখ চকচকে। না-পাওয়ার রুক্ষতা নেই। ওর মনটা প্রসন্ন হল। রুগ্‌শুগ্‌ চেহারা, অম্লালোলুপ চোখ আর নোংরা পোশাক ওর সহ্য হয় না।

চার দিক দেখতে-দেখতে, সব কিছু ভাবতে-ভাবতে সাময়িকভাবে বুড়োর কথা ভুলে গিয়েছিল অনির্বাণ। তাঁর কথা খেয়াল হতে ফিরে তাকাল। বুড়োর চোখেমুখে কষ্টের ছাপ। তিনি হাতের লাঠিটাকে যতদূর ক্ষমতায় কুলোয় শক্ত করে ধরে তার ওপর ভর দিয়ে আছেন। মাথাটা একটা ধারে সামান্য কাত হয়ে গেছে। বুড়োর কাত-হয়ে-যাওয়া মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ওর সামনে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কাঁটার-মুকুট-পরানো হেলে-থাকা মাথার ছবি ভেসে উঠল।

অনির্বাণ ধাক্কা খেল। ওর পাশে দাঁড়ানো একটা লোক, ঘাড়ে তার মাংসের ভাঁজ, থলথলে শরীর, বিরাট মুখমণ্ডল, আশপাশের সব ব্যাপারে চৈতন্য-হীন, নিজের সুবিধার জন্য যতখানি জায়গা দরকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখ পোঁছার জন্য রুমাল নিতে গিয়ে ওকে ধাক্কা দিয়েছে। ধাক্কা খেয়ে সচেতন অনির্বাণ দেখল বুড়ো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। ও শ্রদ্ধা-মেশানো স্বরে প্রশ্ন করল—'আপনার কি দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে?'

বৃদ্ধ খুব শান্ত, স্বপ্নিল স্বরে বললেন—'এ ট্রেনে তো কষ্ট করেই যেতে হয়। যাত্রীরা অন্য মানুষ সম্পর্কে যতক্ষণ না সচেতন হবে ততক্ষণ কষ্ট করেই যেতে হবে।'

কিন্তু অনির্বাণ পরিস্থিতিকে অত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারল না। ওর মনে হল—তাহলে তো অনেক দিন, অনির্দিষ্ট কাল, যাঁর ক্ষমতা নেই, যাঁকে একটু জায়গা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেটা তো মনুষ্যোচিত নয়। বুড়োর দিকে ও আরেকবার দেখল। ওঁর চোখেমুখে জীবনের অভিজ্ঞতা, স্থিতধী প্রজ্ঞার ছাপ। তিনি মানুষ এবং মানুষের জীবন নিয়ে অনেক ভেবেছেন, এবং এখনও মানুষের প্রতি আস্থা হারান নি, বিক্ষুব্ধ হন নি, বিরক্ত হন নি। কৌতুকে, মজায় সব-কিছু দেখছেন। সে লক্ষ করল—উনি এত কষ্টের মধ্যেও বড়ো আগ্রহ নিয়ে কামরার মানুষগুলোকে দেখছেন স্নেহ আর প্রশ্রয়ের চোখে।

ও ছটফট করে উঠল। এমন মানুষকে বসার একটু জায়গা কি কামরার এই যাত্রীরা দেবে না? কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেবে। সে আবার বৃদ্ধের হাত ধরল। কামরার বেশির-ভাগ মানুষ যে দিকটায় বসে আছে সে দিকটায় এগিয়ে গেল। গাড়িটা চাকা আর লাইনের শব্দ ও ছন্দে গতি নিল।

প্যাসেজে দাঁড়ানো যাত্রীদের বলে-কয়ে জায়গা করে শেষ প্রান্তের দেওয়াল-ঘেঁসা লম্বা সিটটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। প্যাসেজে দাঁড়ানো যাত্রীদের অনেকে বুড়োর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল—'ইশ কী কষ্ট! একটু বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন না ভাই!'

কিন্তু তারা কেউ নিজে উদ্যোগ নিল না। নিজের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে পাশের সিটটার দখল নেওয়া যাবে তার জন্য। কেউ-

কেউ ওকে লম্বা সিটটার দিকে এগোতে দেখে পেছন থেকে বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে যান। ওখানে একটা জায়গা নিশ্চয়ই পাবেন।'

লম্বা সিটটার সামনে দাঁড়াতে সেখানে বসে থাকা যাত্রীরা বেজার মুখ এদিক ওদিক ফিরিয়ে নিল। ওদের আসতে দেখে যুবক যাত্রী যারা বসে ছিল তারা আগেভাগেই ঘুমের ভান করে চোখ বুজে ফেলল।

অনির্বাণ সিটটা ভালোভাবে লক্ষ করে দেখল। যারা বসে আছে তারা একটু আঁটোসাটো হয়ে বসলে বুড়ো মানুষটার বসার মতো জায়গা হয়ে যায়। অথচ সকলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। কেউ-কেউ একটু বেশি জায়গা নিয়ে। দুদিকের জানালার ধারে বসা দুজন লোকই প্রথম জায়গা দখল নেওয়ার সুবাদে বেশ খানিকটা এলিয়ে বসেছে। এদের একজনের রাশ-ভারি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত মানুষের চেহারা, তার পরনে ফিনফিনে, ধবধবে ধুতি-পানজাবি, চোখে রিমলেশ চশমা; আরেক জনের গলায় সোনার চেন, গায়ে সিল্কের পানজাবি, পরনে জিন্সের প্যানট, হাতে গ্রহশান্তির গোটা কয়েক আংটি, মুখে স্থূলতার ছাপ। অথচ দুজনে একইভাবে জায়গা দখল করে রেখেছে।

অনির্বাণ প্রথম জনের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল—'স্যার, একটু চেপে এই বৃদ্ধকে বসতে দেবেন?'

ভদ্রলোক চশমার ভেতর থেকে নিষ্প্রাণ শীতল চোখে তাকিয়ে মুখের ওপর একটা মাছি বসার বিরক্তিজাত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে বলল—'জায়গাটা কোথায় যে সরব?'

ও এবার অন্য জানলার পানজাবি-পরাকে বলল—'দেখুন না দাদা, যদি একটু জায়গা দেওয়া যায়?'

লোকটি খুবই কর্কশভাবে বলে উঠল—'দেখছেন না মশাই, একটুও জায়গা নেই!'

অনির্বাণ হতাশ হল। দুটো লোকেরই চোখের পাতা নেই। তবুও তাদের পালটা বলতে পারল না আপনারা একটু সোজা হয়ে বসলেই তো জায়গা হয়। এমনভাবে কথা বলতে ওর রুচিতে বাধে। ওর মনে হয় আচরণে স্থূলতা প্রকাশ পেল।

ওই সিটের মাঝখানে এক ধার্মিক তার দুই অনুগতকে নিয়ে বসে ছিল। ওর কানে এসেছে মানুষটা তার সঙ্গীদের মানবসেবা, জীবসেবা, মহৎ হৃদয়বত্তা ইত্যাদি মিষ্টি গলায় এক অনির্বচনীয় শব্দের মালায় গেঁথে শোনাচ্ছে। ওর মন আশার আলোয় নেচে উঠল। লোকটির পোশাকেও বৈরাগ্যের ছাপ।

অনির্বাণ প্রবল আশা নিয়ে বৃদ্ধের হাত ধরে লোকটার সামনে এগিয়ে গেল। শ্রদ্ধা, বিনয় ও কাতরতা মেশানো স্বরে অনুরোধ করল—'দেখুন, এই বুড়ো মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। উনি দীর্ঘকাল এই ট্রেনের যাত্রী। এত দিন বসার দরকার করে নি। উনি এখন জীবনের শেষ পাদে ঈশ্বরের কাছাকাছি।'

সেই ধার্মিক অমায়িক হেসে বলল—'তাহলে তো ওঁর উচিত উর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রার্থনা করা। কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যাবে কী করে!'

তার অনুগত লোকেরা সমস্ত ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে চারপাশ ঘিরে রইল। হতাশ অনির্বাণ ঘুরে এবার অন্যান্য সিটগুলির দিকে নজর ফেলল। বুড়োর এক হাতে লাঠি, আরেক হাত অনির্বাণের হাতে, তাঁর ক্লান্ত শ্রান্ত গলায় বিড়বিড় শব্দ 'মানুষই ঈশ্বর'।

কামরার ওই অংশের অন্যান্য সিটে যারা বসে আছে তারা সকলেই চোখ বুজে রয়েছে। অনেকেই ঢুলে-ঢুলে পড়ছে। মানুষগুলো বসার সুযোগ পেয়ে, যাত্রার ঢুলুনিতে সমসময়ের চেতনাশূন্য। যাচ্ছে এবং কোনোরকমে জায়গা পেয়ে যেতে পারছে—এই ভরসা নিয়ে তারা আরামে চোখ বুজেছে। সম্পূর্ণ ভুলে গেছে পারিপার্শ্বিক, মানবিক দায়িত্ব বা কর্তব্য। তাই তারা এক অশক্ত, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বৃদ্ধের জন্য অনির্বাণের এই চেষ্টাকে চোখ খুলে দেখারও চেষ্টা করল না। নির্বিকার ওই মানুষগুলোর দিকে সামান্য প্রত্যাশা নিয়ে তাকাতে তাকাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওর

ইচ্ছা করল একটা প্রবল চিৎকার করে উঠতে। ভেতর থেকে তীব্র তাগিদ এল লোকগুলিকে দু-হাত দিয়ে ধরে সবল ঝাঁকুনিতে সচেতন করে তুলতে।

কিন্তু পেরে উঠল না। সিটে-বসে-থাকা মানুষেরা অনেকেই ক্লান্ত, অনেকে শ্রান্ত। তাদের দেহে জীবনের নানা বিপর্যয়ের ছাপ। লোকগুলোর ওপরে তার মায়া হল।

অনির্বাণ আবার সেই ক্রশচিহ্নের মতো দেখতে প্যাসেজে এসে পড়ল। অপর দিকে কামরার ছোটো অংশ। সেখানে দেয়াল ঘেঁষে টানা সিট। উলটো দিকেও সিট আছে। মাঝখান দিয়ে প্যাসেজ। ওই ক্রশে পৌঁছে বৃদ্ধের অভিজ্ঞ চোখ কৌতুকে ঝিকমিকিয়ে উঠল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন—'হে যুবক, অস্থির হবেন না। আত্মার মুক্তি এখনো ঘটে নি। এই কামরায় যত জন বসে যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি দাঁড়িয়ে। আমিও যাই না এদের সঙ্গে সেইভাবে।'

অনির্বাণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বৃদ্ধের দিকে তাকাল। মুখেচোখে অক্ষমতার কোনো চিহ্ন না থাকলেও ওঁর দেহ যে আর বইতে পারছে না তা পরিষ্কার। ওর মধ্যে আবার অস্থিরতা ফিরে এল। বুড়োকে একটু জায়গার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। ও সাহায্য বা পরামর্শের প্রত্যাশায় চার পাশে তাকাল। বোঝা যাচ্ছে না সেরকম কে আছে। ঠিক সেই সময়ই লোক দুটোকে চোখে পড়ল। দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে একটা স্টেশনে গাড়িটা থেমেছিল। সেখান থেকেই উঠেছে। তার আগে লোকদুটো ছিল না।

ওদের চেহারা কর্কশ। হাতে স্টিলের বালা। গায়ের জামাকাপড়ে কালিঝুলির চিহ্ন। দেখলেই বোঝা যায় তারা কোনো কলকারখানায় কাজ করে। লোক দুটো মাঝে-মাঝেই অনির্বাণ আর বুড়োর দিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনোই আশা ও করে না। অতখানি মানবিক বোধ তাদের মধ্যে থাকতে পারে বলে ওর ভরসা নেই।

অনির্বাণ নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে চনমনে করে তুলল। হতাশ বা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে লাভ নেই। চেষ্টা করতে হবে নিজেই। ও বৃদ্ধের হাত ধরে টান দিতে গিয়ে চমকে উঠল। তাঁর গায়ে জামা নেই। ধুতিটা হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। পায়ে চপ্পল। চোখে গোল চশমা। মাথা পুরো নেড়া। মুখে স্মিত হাসি। অনির্বাণ বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'বাপুজী!'

বৃদ্ধ ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন। দৃঢ় অথচ নম্র স্বরে বললেন—'মনে জোর রাখো। আত্মার শক্তি তোমাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।'

অনির্বাণের সমস্ত হৃদয় মন অপরিসীম এক ভরসায়, সাহসে আর বিশ্বাসে উদ্দীপিত হল। ও দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগোল। কামরার ওই ছোটো অংশে দেয়াল-ঘেঁষা টানা সিটটাতে অনেক যুবক-যুবতী আরাম করে বসে হাসি-ঠাট্টা-গান করতে-করতে যাচ্ছিল। চেহারা পোশাক-আশাক দেখলে বোঝা যায় তাদের অবস্থা ভালো। জীবন তাদের কাছে আনন্দ আর উল্লাসের। তাদের উলটো দিকে যে বয়স্ক যাত্রীরা বসে আছে তাদের দেখলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তারা আরামে বিলাসে মানুষ। তারা ওই যুবক-যুবতীদের স্নেহের সুরে উৎসাহিত করছিল। ওরা দু-দল কামরার ওই ছোটো অংশে অন্য কোনো যাত্রীকে ঢুকতে দেয় নি। ওখানে হাওয়া খেলছে ভালো। গাদাগাদিও নেই। অনির্বাণ বৃদ্ধের হাত ধরে ওখানে ঢুকে পড়তে ওরা সবাই হৈ চৈ করে উঠল। ও থতমত খেয়ে বাপুজীর দিকে তাকাল। আবার বিস্ময়ে চমকে উঠল সে। বৃদ্ধের মাথাভরতি ঝাঁকড়া সাদা চুল। মুখ থেকে নেমেছে সাদা দাড়ির ঢল। গায়ে আলখাল্লা। দুটি হাত পেছনে। মুখে অনির্বচনীয় উপলব্ধির স্বপ্নময় উদাসীনতা। কালোত্তীর্ণ ঋষি।

—'গুরুদেব!' ওর অজান্তে সকল পাওয়ার পুলকে

অস্ফুট সঙ্গীত বেজে উঠল। ও আকুলভাবে যাত্রীদেরকে বলে উঠল—'একটু জায়গা দিন না এঁকে। উনি দীর্ঘক্ষণ বড়ো কষ্টে দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষ একটুখানি জায়গা ওঁকে দিতে পারছে না দেখে উনি ব্যথিত।'

বসে-থাকা যুবক-যুবতীরা, সম্পন্ন যাত্রীরা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কোতুকের চোখে বৃদ্ধ এবং অনির্বাণের দিকে তারা তাকিয়ে আছে। তাদের মুখ-ভঙ্গিতে প্রশ্ন—উনি কে? তাদের সেই হাসির শব্দে সচকিত গোটা কামরার অন্যান্য যাত্রীরাও অবাক চোখে অনির্বাণ ও বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুলল—উনি কে?

অনির্বাণ এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে হতচকিত। সত্যিই তো উনি কে? ওঁকে তো ও প্রথমে দেখেছে একজন সাধারণ বৃদ্ধ হিসেবেই যাঁর মুখে অবয়বে জীবন ও মানুষের অভিজ্ঞতা গভীর, অথৈ! কিন্তু তার পরেই তো ওঁকে মনে হয়েছে যিশুর মতো! আবার এক সময় ওর মনে হয়েছে ও গান্ধীজীর হাত ধরে আছে! আর একটু আগে তো দেখেছে সেই বিশ্বমানবের রূপ, রবীন্দ্রনাথ যাঁর নাম! তাহলে উনি কে?

সংশয়াচ্ছন্ন, দ্বিধাগ্রস্ত অনির্বাণ ভুলে গেল ওঁকে একটু জায়গা দেবার প্রয়োজনীয়তা। সকল যাত্রীই এখন অনির্বাণের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে। লোকটার মতলব কী?

ঠিক সেই সময় কর্কশ চেহারার সেই লোকদুটো ওদের পাশে এসে দাঁড়াল। দারুণ রুক্ষ মেজাজি স্বরে বলল—'আপনারা মশাই আচ্ছা লোক তো! একটু সরে বুড়ো মানুষটাকে বসতে দিতে পারছেন না?'

কে যেন বলে উঠল—'কী করে বসতে দি এখানে? জায়গা কোথায়?'

—'জায়গা নেই বলছেন? জায়গা কী করে বেরয় দেখিয়ে দেব?' লোকদুটো চোখ পাকিয়ে হাতের পেশী ফুলিয়ে বসে-থাকা লোকগুলোর দিকে এগোল। যাত্রীরা ওদের দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রইল আর নিজেদের অজ্ঞাতসারে ঘষটে-ঘষটে সরে যেতে লাগল। একজন বয়স্ক যাত্রী অমায়িক গলায় অনির্বাণকে বলে উঠল—'বসুন না স্যার! ওঁকে নিয়ে আপনিও বসুন। যথেষ্ট জায়গা হয়ে যাবে!'

চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক সংস্কার : ভারতের কী শিক্ষণীয়?

জয়ন্তকুমার রায়

১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে চীনে, এবং ১৯৮৫ সাল থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায়, যে অর্থনৈতিক নবনির্মাণ চলেছে, তার মূল্যায়ন, এবং তা থেকে ভারতের কী শিক্ষণীয়, এটা জানতে হলে প্রথমেই ভাবা দরকার —একটি দেশের নীতিনির্ধারকদের সামনে মৌলিক লক্ষ্য কোন্‌গুলি। আমার মতে, চারটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, যদিও এগুলির মধ্যে আংশিক হেরফের অপরিহার্য। যথাসম্ভব পৃথকভাবে এই লক্ষ্য-গুলি মনে রেখে চীন আর রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সংস্কার ওই লক্ষ্যগুলি অর্জনে কতটা সফল সেটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন, এবং তার সঙ্গে চিন্তা করা দরকার—ভারতে ওই সংস্কার প্রবর্তিত হওয়া উচিত কিনা।

১

নীতিনিয়ামকদের প্রথম লক্ষ্য হবে—সঙ্গত মূল্যে গ্রহণীয় মানের দ্রব্যসম্ভার আর পরিষেবার যথাসময়ে পর্যাপ্ত সরবরাহ। এ ব্যাপারে চীন আর রাশিয়ার অভিজ্ঞতা চমকপ্রদ এবং শিক্ষাদায়ক। প্রাক-সংস্কার চীনে বা রাশিয়ায় প্রায় সব সামগ্রীর—তা সে ভোগ্যপণ্যই হোক বা মূলধনী দ্রব্য হোক—ঘাটতি ছিল অবিরাম আর ব্যাপক। ওই ঘাটতি অবশ্য বিজ্ঞাপিত হত না, কারণ সংবাদপত্রের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, চীনে একটি কারখানায় বৎসরের পর বৎসর বিক্রয়ের অযোগ্য, ফলে অবিক্রীত, লক্ষ-লক্ষ ঘড়ি তৈরি হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দোকান খোলার অনেক আগেই বিপুলসংখ্যক ক্রেতা সারি বেঁধে অপেক্ষা করেন, কিন্তু অল্প কিছু লোক দোকানে প্রবেশ করার পরই ক্রয়যোগ্য সামগ্রী ফুরিয়ে যায়। যে দ্রব্যগুলি দোকানে পড়ে থাকে, সেগুলি হয়তো অপ্রয়োজনীয় বা অতি নিকৃষ্ট মানের। শীতকালে একজন ক্রেতা ভারী বুটজুতোর সন্ধানে এসে

দোকানে হয়তো দেখলেন হালকা চটিজুতো মিলছে। তিনি নিতান্ত অসহায় বোধ করতে পারেন, যেহেতু তাঁর পুরানো ছেঁড়া বুটজুতো মেরামত করা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ, যিনি ওই মেরামত করতে পারেন, তিনি তো একজন সরকারি আমলা, এবং মাইনে পাবার জন্য তাঁর সময়মতো ন্যূনতম কাজ করারও প্রয়োজন নেই। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য যে, ঘাটতি দূর করে জনস্বার্থে কারখানা চালু রাখার জন্য রাশিয়ায় এক ধরনের 'নিঃস্বার্থ বা আত্মত্যাগী অপরাধী'র আবির্ভাব হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন সৎ ও কর্মদক্ষ ব্যবস্থাপক দেখলেন যে, তিনি যদি বিধিমতো সরকারি প্রতিষ্ঠান মারফত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ সরবরাহের আশায় অপেক্ষা করেন, তাহলে তাঁর কারখানা দীর্ঘকাল অচল হয়ে থাকবে। তিনি জানতে পারলেন যে, পাশের একটি কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু ওটি সংগ্রহের জন্য তাঁকে উৎকোচ দিতে হল। এভাবে তিনি অসদুপায় অবলম্বন করে কমিউনিস্ট দল ও সরকারের কর্মকর্তাদের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার কুফল থেকে কারখানাকে পরিত্রাণ করলেন। দেশ উপকৃত হল। কিন্তু ওই কর্মনিষ্ঠ ব্যবস্থাপক যদি ধরা পড়তেন, তাহলে তাঁকে শাস্তি পেতে হত।

প্রাক-সংস্কার যুগের এসব সমস্যার সমাধান সংস্কারোত্তর কালে চীন এবং রাশিয়ার সেইসব স্থানেই সম্ভব হয়েছে, যেখানে সংস্কার চালু হয়েছে। বলাই বাহুল্য, চীন আর রাশিয়ার মতো বিরাট দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে মানবিক এবং অন্যান্য সম্পদের লভ্যতায় বিপুল পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষত, দল ও সরকারের আমলাবর্গে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অতীব প্রকট। ফলে, বিশাল একটি দেশের সমস্ত অঞ্চলে সংস্কার প্রবর্তন করতে সুদীর্ঘ সময় লাগবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে ব্যাপারে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-রচয়িতাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, সেটি হল—চীনে আর রাশিয়ায় যেসব জায়গায় সংস্কার গৃহীত এবং সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে, সেখানে সাফল্যের প্রধান কারণ হল ওই সংস্কার মারফত ব্যক্তিগত আগ্রহ, উদ্যম ও সংগঠনী শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং ওই শক্তিকে সক্রিয় করা হয়েছে। তেঙ শিয়াও পিঙ আর মিখাইল গোরবাচেভ দুজনেই ওই সক্রিয়তার ওপর স্পষ্টভাবে জোর দিয়েছেন। তেঙ অবশ্য উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশের ওপর ঝোঁক রেখেছেন, আর গোরবাচেভ রাজনৈতিক লবজ পরিহার করে সরাসরি জীবনযাত্রার মানে ত্বরিত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন। তা ছাড়া, তেঙ আর গোরবাচেভের বক্তৃতা-রচনা পাঠ করলে এই ধারণা জন্মানোও স্বাভাবিক যে, ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তেঙের তুলনায় গোরবাচেভ অনেক বেশি আগ্রহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় ১৯৭৮-৭৯ সালে, আর সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯৮৫ সালে। স্পষ্টত, ওই সংস্কারের অগ্রগতি রাশিয়ার তুলনায় চীনে অনেক বেশি মাত্রায় ঘটেছে। আবার, চীনে শহরের তুলনায় গ্রামে এই সংস্কার অধিকতর পরিব্যাপ্ত। কৃষিতে সংস্কারের মুখ্য অবলম্বন হল পরিবারভিত্তিক চুক্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে আর পরিষেবায় সংস্কারের প্রধান ভিত্তি চুক্তি ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের ব্যবস্থা। এ ছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত-সমবায়-যৌথ উদ্যোগেরও বিকাশ ঘটেছে। চীনে শতকরা ত্রিশ ভাগেরও কম সরকারি উদ্যোগে সংস্কারের প্রচলন হয়েছে, আর সমগ্র উৎপাদনের শতকরা মাত্র এক ভাগ আসে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু এই সীমিত সংস্কারের সুফলই এক কথায় যুগান্তকারী। মস্কোতে সর্বত্র ক্লান্ত ক্রেতার যেসব দীর্ঘ সারি দেখা যায়, পেইচিঙ বা শাঙহাইতে, শেনইয়াঙ বা হারবিনে এই করুণ পরিস্থিতি চোখে পড়ে না। তা ছাড়া, মস্কোতে যেমন অসহনীয়রকম দীর্ঘ সময় অপেক্ষা না করলে, বা উৎকোচ না দিলে, রাস্তায় ট্যাক্সি বা

ভোজনালয়ে পরিচারিকার সাক্ষাৎ মেলে না, চীনের শহরগুলিতে তেমন কষ্টকর অভিজ্ঞতা ঘটে না। আবার, রাশিয়ায়ও যেখানে নবনির্মাণের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও—যেমন, গৃহনির্মাণসামগ্রীর কারখানায় বা খনিতে, হাসপাতালে বা কোনো অঞ্চলের রেল প্রশাসনে, কৃষিতে বা পশুপালনে—উৎপাদনশীলতায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি পরিস্ফুট হয়েছে, আর তৎসহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা। এই প্রসঙ্গে গোরবাচেভ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, একই চত্বরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত খামারের তুলনায় একটি পারিবারিক চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত খামারে গাভী-পিছু দুগ্ধ-উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ। তা ছাড়া, রাশিয়ায় যে-সমস্ত অঞ্চলে পরিষেবার ক্ষেত্রে সংস্কারের অভ্যুদয় ঘটেছে, সেখানে বিনা কষ্টে চুলকাটা বা জুতো মেরামত সম্ভব হয়, একটি দূরদর্শনযন্ত্র বা মোটরগাড়ি মেরামত আনির্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষা বা উৎকোচ প্রদান ছাড়াই সম্পন্ন হয়।

২

নীতিপ্রণেতাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত—সামাজিক ন্যায়বিচার বা সমদর্শিতা। এজন্য কাজ আর রোজগারের মধ্যে ন্যায়সম্মত সম্পর্কনির্ণয়ই বোধহয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ব্যাপারে সমাজবাদী রাষ্ট্রে পবিত্র গোমাতা বধের জন্য অপরিসীম কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন তেঙ শিয়াও পিঙ : তিনি অন্ধ সমতা বা অসম কাজের জন্য সমপরিমাণ মজুরির নীতির বিরোধিতা করেছেন। সাম্যবাদের ছদ্মবেশে রোজগারের অভিন্নতা যেসব কুফলের সৃষ্টি করে সেগুলি হল : নিয়মানের কর্মদক্ষতা, উদ্যমহীনতা, আর ব্যাপক ঘাটতি। অবশ্য (কমিউনিস্ট) দল ও সরকারের পদস্থ আমলারা ঘাটতিজনিত অসুবিধা ভোগ করেন না। কারণ, আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা, মোটরগাড়ির ব্যবহার, বিমানে বা রেলে স্থানলাভ, থিয়েটার-সিনেমার টিকিট ইত্যাদি প্রায় সব ব্যাপারে আমলারা অসাধারণ সুবিধার অধিকারী। বাসস্থান, চিকিৎসা—এসব দ্রব্য-গুলির দাম যে আকর্ষণীয়ভাবে কম, তা থেকে সাধারণ মানুষ যে খুব একটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন না, তার একটি কারণ এগুলির নিরন্তর আর অনিঃশেষ অপ্রাচুর্য। অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ : এই দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য-গুলির বণ্টনে নির্লজ্জ স্বজনপোষণ আর ভ্রষ্টাচার। নিত্য-প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসের সরবরাহও যেন আমলাদের দেওয়া ভিক্ষা বা উপহারে পর্যবসিত হয়। এর ফলে ব্যক্তিকে যে শুধু জাগতিক দুর্গতি ভোগ করতে হয়, তাই নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি মর্মান্তিক হয় ব্যক্তির মর্যাদাহানি।

সংস্কারোত্তর কালে অবাস্তব সমতার তত্ত্বের বিরোধিতায় রাশিয়ার তুলনায় চীন অনেক বেশি অগ্রসর। তেঙ তো অকপটে ঘোষণা করেছেন—যে সামাজিক ভাণ্ড থেকে সবাই সমানভাবে আহার্য সংগ্রহ করে, সেটিকে চূর্ণ করা অত্যাবশ্যক। চীনে যেসব কারখানায় সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে কাজ আর রোজগারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সমগ্র চীনেই ব্যাপক হারে এই সংস্কার প্রবর্তিত হতে পারত, যদি না সংস্কারের ফলে যাঁদের কায়েমি স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই দলীয়/সরকারি আমলাদের অনেকেই সংস্কারের বিরোধিতা না করতেন। ভারতেও যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সংস্কার প্রবর্তনে অনেক সরকারি আমলাই বাধা দেবেন, এটা মোটামুটি প্রত্যাশিত, কারণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন যেসব সুবিধা তাঁরা ভোগ করছেন, সেগুলি সংস্কারের ফলে বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য চীনের তুলনায় ভারতে শাসকদলের আমলাবর্গ নিতান্তই শক্তিহীন, যার ফলে ভারতে রাষ্ট্রীয় কার-খানায় সংস্কার প্রবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হতে পারে। সংস্কারের ফলে চীনে সমতাতত্ত্বের অসারতার যেসব নিদর্শন মিলছে, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যায়। সংস্কারোত্তর চীনে এমন কারখানা আছে

যেখানে একজন কর্মতৎপর নারীশ্রমিক একজন কর্মবিমুখ পুরুষশ্রমিকের চেয়ে তিনগুণ বেশি রোজগার করেন। কৃষিক্ষেত্রে আরও চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। চীনে এমন কৃষিজীবী পরিবারও দেখা যাবে যার ২৪-কক্ষ-বিশিষ্ট বাড়ি ও ৫টি দূরদর্শনযন্ত্র আছে; মোটরগাড়ি, যন্ত্রগণক এমনকী বিমানপোতও কোনো-কোনো পরিবারে আছে। একটি অত্যন্ত দরিদ্র গ্রামে আঙুচায়ে অগ্রণী এক পরিবার চার বছরে ৪০০,০০০ ইউয়ান আয় করেছে। এই পরিবারের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের অন্যান্য পরিবারগুলির গড় আয় বার্ষিক ১০,০০০ ইউয়ানে পৌঁছে যায়; মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় মাত্র ৩৬৫ ইউয়ান থেকে বেড়ে ৩০০০ ইউয়ান হয়। যে দেশে একজন কারখানা শ্রমিকের বার্ষিক গড় আয় ১৪৬০ ইউয়ান, সেখানে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত গ্রামের কৃষিজ আয় অভূতপূর্ব কৃতিত্ব সূচিত করে। এবং এই আয়ের উৎস ব্যক্তিগত/পারিবারিক উদ্যম, যাকে স্বীকৃতি জানালে ব্যক্তি ও সমাজ যুগপৎ উপকৃত হয়।

এভাবে আমরা একটি তত্ত্বগতভাবে আপাত-বিভ্রান্তিকর কিন্তু বাস্তব নির্জলা সত্যের সম্মুখীন হই: কর্মক্ষেত্রে নৈপুণ্যের প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য অনুযায়ী আয়ের বৈষম্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক, এবং ওই বৈষম্য বোধহয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। অবশ্য, অসমান কাজের জন্য অসমান রোজগারের নীতি যত সহজে কারখানায়-খামারে প্রয়োগ করা যায়, তত সহজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে হয়তো করা যাবে না। প্রসঙ্গত, ভারতীয়দের এটা শিক্ষণীয় যে, ১৯৮০-র দশকে চীনে শত-শত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ গবেষণা-প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন, বেসরকারি ও ক্ষুদ্র/মাঝারি সরকারি উদ্যোগগুলিকে (বিশেষত যেগুলি জেলায় বা গ্রামে অবস্থিত) প্রকৌশল সরবরাহ করেছেন, এবং বিপুল পরিমাণে রোজগার করছেন। এই উদ্যম বা প্রতিভা যাঁদের নেই, এমন বহু বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র থেকে গিয়ে অনেক কম রোজগার করছেন।

প্রসঙ্গত, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যক্তিকে বস্তুগত উৎসাহদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে গোরবাচেভ সম্পূর্ণভাবে গোঁড়ামি-ভণ্ডামি থেকে মুক্ত। গোরবাচেভ নির্দ্বিধায় বলেছেন যে, সঙ্গত ব্যক্তিস্বার্থের মর্যাদা না দিলে কৃষি বা শিল্পের কোনো ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত অগ্রগতি সম্ভব নয়। যখন ক্ষমতাসীন আমলাবর্গ ব্যক্তিকে ঐহিক সুবিধাদানের বিষয়টি অবজ্ঞা করেন, তখন একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার ব্যবহার্য সম্পদের তুলনায় নিতান্তই কম হয়। এই সত্য অতি সহজবোধ্য, নেহাতই সাধারণ, কিন্তু প্রাক-গোরবাচেভ আমলে সর্বগ্রাসী অন্ধবিশ্বাসের আবেষ্টনীতে এটি উচ্চারণ করার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে চাকুরিরত বা অবসর-প্রাপ্ত একটি আমলাগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যাঁরা সমাজবাদের আড়ালে আত্মস্বার্থপোষণের অগণিত কৌশল উদ্ভাবন করে উপরোক্ত সত্য বিসর্জন দিয়েছেন।

৩

নীতিরচয়িতাদের তৃতীয় লক্ষ্য হবে—সংবেদনশীল তথা দায়িত্ববান প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা। প্রায় সমস্ত দেশেই—সোভিয়েত রাশিয়ায় হোক বা ভারতেই হোক—সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রকট যে (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) সরকারি আমলারা মূলত অনুভূতিহীন, দায়িত্ববিমুখ। রাষ্ট্রীয় আমলাবর্গের ক্ষমতা যতই বাড়ে, দায়িত্ববোধ ও সংবেদনশীলতা ততই কমে। একটি সমাজবাদী দেশে সরকারি আমলাবর্গের ক্ষমতা সর্বাধিক। এটাও মনে রাখতে হবে যে, একটি সমাজবাদী দেশে রাষ্ট্রীয় আমলাবর্গের পাশাপাশি ক্ষমতাসম্পন্ন দলীয় আমলাবর্গের দাপটও সাধারণ নাগরিককে অতিষ্ঠ রাখে—

ভারতের মতো দেশে অবশ্য সাধারণ মানুষ শাসকদলের আমলাবর্গের তুলনীয় দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত।

চীনে সংস্কার যতখানি সাফল্য অর্জন করেছে, ততখানি সাফল্য দল আর রাষ্ট্রের দুই আমলাবর্গের ক্ষমতা খর্ব করেই অর্জিত হয়েছে। দেশের সংস্কার-প্রভাবিত কিছু অঞ্চলে প্রদেশ, মহানগর, জেলা ও শহর পর্যায় অবধি বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শাংহাই মহানগরের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ত্রিবার্ষিক চুক্তি অনুযায়ী শাংহাই কেন্দ্রকে ১০৫ বিলিয়ন ইউয়ান দেবে। এই মহানগরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা কর আদায়ের কোনো ব্যবস্থাই নেই। চুক্তিমতো উপরোক্ত অর্থ কেন্দ্রকে দিলে বাকি সমস্ত সম্পদ শাংহাই তার নিজের ইচ্ছা আর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন প্রশাসনে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইত্যাদিতে—নিয়োজিত করার পূর্ণ অধিকার ভোগ করে। ভারতের নীতিনিরূপকদের কাছে এটা অবশ্যই লক্ষণীয় আর শিক্ষণীয় যে, শাংহাইয়ের মোট আয়ের শতকরা নব্বই ভাগ আসে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের লাভ থেকে। এই লাভের মূল কারণ ১৯৭৮-এর পরবর্তী অর্থনৈতিক সংস্কার। এখানে উল্লেখযোগ্য—অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের পটভূমিতে, শাংহাইকে একটি প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আবার, মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রদেশের (যেমন শাংহাইয়ের) আর্থিক চুক্তি আছে, তেমনি নিম্নতর পর্যায়গুলিতে এই চুক্তি হয় প্রদেশ কর্তৃপক্ষ ও জেলার মধ্যে, জেলা ও শহরের মধ্যে, ইত্যাদি। তা ছাড়া, প্রত্যেক স্তরে, একটি স্থানীয় সরকারের সঙ্গে এক-একটি উদ্যোগের আলাদা-আলাদা চুক্তি আছে। যেখানে-যেখানে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে-সেখানে স্থানীয় সরকার ও উদ্যোগের এই স্বাধিকারও আছে যে তাঁরা মূলধন, প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদেশী সহযোগিতার বন্দোবস্ত করতে পারেন।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণে শুধু যে কেন্দ্রীয় আমলাবর্গের ক্ষমতাই বহুলাংশে খর্ব হয়েছে তাই নয়, উন্নয়নের গতি বিস্ময়করভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। আমলাতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি মারাত্মক বাধা, সেই লাল ফিতের বাঁধন বা সমস্ত কাজে অহেতুক বিলম্ব ঘটানো, উল্লেখযোগ্যভাবে অপসারিত। উদাহরণ: কোনো-কোনো স্থানে যে প্রকল্পে বিদেশী সহযোগিতা প্রয়োজন, তার জন্য সরকারি অনুমোদনও মাত্র তিন সপ্তাহে, এমনকী দশ দিনের মধ্যে, পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া, কারখানার অভ্যন্তরে, সংস্কার প্রবর্তনের ফলে দল বা কমিউনিস্ট পার্টির আমলাদের কর্তৃত্ব কমেছে, আর ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের ক্ষমতা বেড়েছে।

আমলাবর্গকে সংবেদী আর দায়িত্বশীল করে তোলার ব্যাপারে ভারত অনেক কিছু শিখতে পারে চীন আর রাশিয়ার সংস্কারের অভিজ্ঞতা থেকে। পুরাতন আমলাগোষ্ঠী (যাঁরা জেলা প্রশাসন, সচিবালয় ইত্যাদিতে আছেন), অথবা নতুন আমলাগোষ্ঠী (যাঁরা বিদ্যুৎ, ইস্পাত, দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় কারখানায় নিয়োজিত), যাঁদের কার্যধারাই পর্যবেক্ষণ করি না কেন, দেখা যাবে যে, ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই দুই গোষ্ঠীরই আমলাদের প্রায় সবাই সাধারণ নাগরিকের কাছে প্রতিনিয়ত শ্রমাণ দেন অনীহা, অকর্মণ্যতা ও ক্ষমতালোলুপতার এবং তৎসহ কাজে বাধা দেবার বা কাজ এড়াবার বহুবিধ কলাকৌশলের। ভারতে তার বিশাল সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল, অথচ তুলনায় যে উন্নয়ন ঘটেছে তা কেন এত নগণ্য, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আমলাবর্গের উপরোক্ত ত্রুটিগুলির মধ্যে। ভারতীয় আমলাবর্গের শোচনীয় ব্যর্থতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেইসব রুশ লেখকদের যাঁরা মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের দেশের বেশির ভাগ আমলাদের কাছে কিছু করার চাইতে

কিছু না করা অনেক সহজ, যাঁরা সোভিয়েত আমলাদের কাজে প্রতিবন্ধকসৃষ্টি করার পারদর্শিতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। ভারতের সাধারণ মানুষ গোরবাচেভকেও স্মরণ করতে পারেন, যে গোরবাচেভ খেদোক্তি করেছেন—আমলারা বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন কিভাবে কাজ করা উচিত, শুধুমাত্র কর্মস্থলে হাজির হবার জন্যই যেন তাঁদের বেতন দেওয়া হয়। গোরবাচেভ আরও বলেছেন, সাধারণ মানুষ কোনো জরুরি প্রয়োজনে আমলাদের কাছে এলেই বুঝতে পারেন আমলারা উদাসীন, এবং দফতরে সাধারণ লোকের উপস্থিতি আমলাদের কাছে অবাঞ্ছিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমলাবর্গ যে অগণিত দায়িত্বজ্ঞানহীন আদেশ নির্দেশ দিয়ে এসেছেন, তার কয়েকটি নিদর্শন এখানে দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা কৃষকদের হুকুম দিয়েছেন সেই জমিতে গম বুনতে যা গবাদি পশুর বিচরণক্ষেত্র হবার যোগ্য; আবার তাঁরা এমন জমিকে গোচারণক্ষেত্র করার হুকুম দিয়েছেন যা গমচাষের পক্ষে উপযুক্ত। গোরবাচেভের আমলে স্বাধীন মতপ্রকাশের যুগে (গ্লাসনসত), সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির কতিপয় সফল ব্যবস্থাপকের স্বীকারোক্তি প্রচারিত হয়েছে; তাঁরা অকুণ্ঠভাবে জানিয়েছেন, ওপরতলার আমলাবর্গ দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া অসংখ্য দায়িত্ববর্জিত আদেশ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বা এড়িয়ে গিয়েই তাঁরা ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন।

দায়িত্ব বলবৎ করা যাতে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, সেজন্য ভারতীয় আমলারা নানা পদ্ধতি—যেমন ঘন-ঘন এক পদ থেকে আর-এক পদে বদলি—আবিষ্কার করেছেন। তাই ভারতে এমন অবাস্তব-কর পরিস্থিতির উদ্ভব প্রায়ই হয়, যেখানে বর্তমানে রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকারের একজন সচিব, যিনি কয়েক বৎসর আগে জেলা-সমাহর্তা থাকার সময় যে কয়েক কোটি টাকা তাঁর দফতরে তছরুপ হয়েছিল, সেই টাকা সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী সমিতির প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করার স্পর্ধাও রাখেন। আবার, একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের চিরাচরিত দায়িত্বহীনতাকে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করে বলতে পারেন যে, বিদেশ থেকে বহু কোটি টাকার সামগ্রী যদিও তাঁরা ক্রয় করেছেন, ওই সামগ্রীর গুণাগুণ যাচাই করা তাঁদের কর্তব্য নয়। ভারতের এইসব সরকারি সংস্থায় চুক্তি/দায়িত্বের নীতি বা আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নীতি প্রয়োগ করা হয়তো দুরূহ, তবে অসম্ভব নয়। কিন্তু সরকার-পরিচালিত অন্যান্য সংস্থায়, যেমন রাসায়নিক বা ইস্পাত কারখানায়, চীন ও রাশিয়ায় প্রবর্তিত এই ধরনের সংস্কার সহজেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই সংস্কার প্রচলনের পর যখন কোনো-কোনো অসৎ বা অকর্মণ্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক/কর্মী তাঁদের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির সুযোগ, এমনকী চাকরি, হারাবেন অথবা হারাবার সম্ভাবনাটুকু মনে রাখবেন, তখন তাঁদের কারখানার ক্রিয়াশীলতা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু, যেটা চীনে প্রমাণিত হয়েছে, এই সংস্কারের জাদুদণ্ড একজন অবহেলাপরায়ণ কর্মীর জীবনে অভাবনীয় রূপান্তর আনতে সক্ষম; আজ যে শ্রমিক কাজে ফাঁকি দেবার জন্য কর্মচ্যুত হলেন, এবং কিছুদিন বাদে আবার অন্যত্র কাজের সুযোগ পেলেন, তিনি নতুন কাজে এমন উৎসাহ দেখালেন যে তাঁকে আদর্শ কর্মীর পুরস্কার দেওয়া হল।

এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক যে চীনে আর রাশিয়ায় রক্ষণশীল ক্ষমতালিপ্সু আমলারা সংস্কারের প্রবর্তনে বাধা দেওয়ায়, অথবা সংস্কার শুরু হলে তাকে পণ্ড করার ষড়যন্ত্রে, ব্যাপৃত। আর্থিক স্বনির্ভরতার নীতি যেখানে সংস্কারোত্তর রাশিয়ায় প্রচলিত হয়েছে সেখানে দশকের পর দশক আমলারা যেসব দায়িত্বহীন আচরণ করে আসছিলেন, সেগুলি ব্যাহত বা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু অনেক আমলা আত্ম-স্বার্থপোষণে এত অভ্যস্ত যে সংস্কার সত্ত্বেও নানা কায়দায় সম্পদের অপব্যবহার করেছেন—তা সে

রুটি-মাংসই হোক, বা বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়িই হোক। এইসব আমলা নানা অপকৌশল অবলম্বন করে ব্যক্তির বা সমবায়ের উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করেন—যেমন, পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি থাকা সত্ত্বেও জমি বরাদ্দে অযথা টালবাহানা করেন। চীনে আবার বিধিনিয়ম ভঙ্গ করেও নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়গুলি একটি কদর্য অভ্যাস বজায় রাখার চেষ্টা করছেন: অধীন যে উদ্যোগ সংস্কারের ফলে লাভ করেছে, তার কাছ থেকে মন্ত্রণালয় চাঁদা আদায় করে, এবং ওই চাঁদা অযথা নানা প্রশাসনিক কাজে, খানাপিনা ইত্যাদিতে অপব্যয় করা হয়, আর উদ্যোগটির উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪

নীতিপ্রণেতাদের চতুর্থ লক্ষ্য হওয়া উচিত—করায়ত্ত সম্পদের সর্বোত্তম (অন্তত যথাযথ) ব্যবহার। এই লক্ষ্যকে অপর তিনটি লক্ষ্যের সন্নিবেশও বলা যেতে পারে। কোনো দেশেরই প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ অঢেল নয়। কিন্তু সীমিত সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়, আর ওই সম্পদের অযৌক্তিক ব্যবহার সত্ত্বেও যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সুবিশাল হতে পারে। তাই, উপরোক্ত চতুর্থ লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন কার্যকর ব্যবস্থাপনা।

ভারতে সম্পদের অপচয় কী বিপুল আর হত-বুদ্ধিকর, তা জানতে গেলে কয়েকটি সরকারি—যেমন, কমপট্রোলার ও অডিটর জেনারেল-এর দফতর, কমিটি অন পাবলিক আনডারটেকিংস, পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটি—ইত্যাদির প্রতিবেদন পড়াই যথেষ্ট। চীনে বা রাশিয়ায় অবশ্য এখনও এই ধরনের প্রতিবেদন পড়ার সৌভাগ্য সাধারণ নাগরিকের হয় নি। কিন্তু সংস্কারোত্তর যুগে দুই দেশেই, বিশেষত রাশিয়ায়, সরকারি উদ্যোগে সম্পদের অপব্যবহার সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক: ভারতে সরকারি উদ্যোগগুলিতে প্রায় প্রয়োজনের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত বেশি-সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত থাকে অথচ কর্মীরা নিয়মিত কাজের সময়ে (যেমন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত) কাজে দেদার ফাঁকি দেন বলে অনিয়মিত সময়ে (যেমন বিকেল পাঁচটার পরে) কাজ করে প্রচুর বাড়তি রোজগার করেন। এইভাবে কাজের লোকের সংখ্যাধিক্য, কাজের পরিমাণে স্বল্পতা ও অন্যায় রোজগারের বাহুল্যের সংমিশ্রণ রাশিয়ায়ও হামেশা লক্ষ করা যায়। সরকারি ক্ষেত্রের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জনৈক রুশ লেখক একটি সরস মন্তব্য করেছেন: কাজ যত কমবে, রোজগার তত বাড়বে।

সংস্কারোত্তর যুগে রাশিয়ায় সম্পদ অপব্যবহারের যেসব তথ্য প্রকাশিত, তার মধ্যে একটি অতীব চমক-প্রদ বিষয় হল কিভাবে আমলাবর্গের অবহেলায় নানা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার রাশিয়ায় অব্যবহৃত থাকে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ আবিষ্কার রাশিয়ায় পেটেনট লাভ করে তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নিত্যনতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে রাশিয়ার মানুষ জাপান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের মতোই মেধাবী। দুর্ভাগ্যক্রমে, আবিষ্কার-প্রয়োগে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করার যে ক্ষমতা রাশিয়ায় পার্টি আর সরকারের আমলাদের আছে, জাপানে বা আমেরিকায় আমলা-দের সেই বিনাশী ক্ষমতা নেই। রাশিয়ায় আমলা-গোষ্ঠী ওই দুষ্ট ক্ষমতার প্রয়োগ এত উৎসাহের সঙ্গে করেছেন সে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রসর পশ্চিমী দেশ-গুলির তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ পশ্চাৎপদ রয়ে গিয়েছে। স্বয়ং গোরবাচেভ স্বীকার করেছেন যে প্রযুক্তির এই অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের জন্য একই সামগ্রীর উৎপাদনে উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে যে পরিমাণ শক্তির (যেমন, বিদ্যুতের) প্রয়োজন হয়, রাশিয়ার প্রয়োজন তার চাইতে দেড় বা দুই গুণ

বেশি। ছোটোখাটো দৃষ্টান্ত মারফতও এই সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। মেরু অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বাসগৃহ সংক্রান্ত রুশ আবিষ্কার কানাডায় সুচারুভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু ওই আবিষ্কার রাশিয়ায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে অব্যবহৃত থেকেছে। অথচ ওই আবিষ্কার কাজে লাগালে রাশিয়ার অতিশীতল উত্তরাঞ্চল থেকে যে অভিবাসন ঘটে, যার জন্য দেশকে বহু বিলিয়ন রুবল খরচ করতে হয়, সেটি রোধ করা যেত।

প্রসঙ্গত, নানা দেশেই সরকারি সংস্থা দ্বারা সম্পদের অপচয় সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক বা আশঙ্কাজনক তথ্যের সন্ধান সহজেই মেলে। থাইল্যানডে বেশ কয়েকটি সরকারি দফতরে ডজন-ডজন বিভাগ আছে যাদের করণীয় নির্দিষ্ট কাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক শহরে পুলিশ বিভাগের কর্মী-সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়েও দেখা গিয়েছে যে, সমগ্র বাহিনীর কাজের সময়ের যোগফলে বিশেষ হেরফের হয় নি। ভারতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থায় হাজার-হাজার নতুন কর্মী নিয়োগের পরও দেখা যায় যে, ওই কর্মীদের কোনো কাজই নেই, এবং সংস্থার কাজের বৃহদংশই (সময়ে সময়ে শতকরা পঁচাশি ভাগ) বেসরকারি ঠিকাদারদের দিয়ে করানো হয়। ভারতের একটি রাজ্যে সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী হাজার-হাজার গ্রামীণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা মাইনে পান, কিন্তু বিদ্যালয়গুলি ভুতুড়ে বিদ্যালয়—না আছে বিদ্যালয়ভবন, না আছে ছাত্র। অথচ, ওই বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার কেবল উপরোক্ত প্রতিবেদনটির প্রকাশ বন্ধ করলেন।

বহু সরকারি সংস্থা বিরাট মূলধনী ব্যয়ে নির্মিত হয়, কিন্তু যন্ত্রপাতির গুণাগুণ সেগুলি কেনার সময় সঠিকভাবে যাচাই করা হয় না। আবার, ওই যন্ত্রপাতির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পালিত হয় না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। সরকারি সংস্থা দুর্গাপুর রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠাপর্বে যখন ফরাসি পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে কারখানাটি রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়, তখন পরীক্ষামূলকভাবে কারখানাটি চালিয়েও দেখা হয় নি যে যন্ত্রপাতি ঠিকমত সরবরাহ করা হয়েছে কিনা, অথচ সেটাই ছিল রাজ্যের আমলাবর্গের ন্যূনতম কর্তব্য। ফলে, দেখা গেল, দশকের পর দশক ওই কারখানার যন্ত্রপাতিগুলি নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রয়েছে। আবার, একই রাজ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যাপারে গাফিলতিতে একটি সরকারি পরিবহণ সংস্থার তিন বৎসরে যা ক্ষতি হয় তার পরিমাণ মূলধনী ব্যয়কেও ছাপিয়ে যায়। খোদ রাজধানী দিল্লীর সরকারি পরিবহণ নিগমে তো ক্ষতির বহর শত-শত কোটি টাকা।

এটা গভীর উদ্বেগের ব্যাপার যে, শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলিতেই নয়, যেগুলি সরকারের চিরাচরিত দায়িত্বের ক্ষেত্র, যেমন রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, সেসব ক্ষেত্রেও সরকারের ব্যর্থতা শোচনীয়ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার অনেকগুলি শহরেই রাস্তা পরিষ্কার রাখার ইজারা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারা নিয়েছেন, এবং তাঁরা ওই কাজ সরকারের তুলনায় অনেক কম খরচে ও অনেক বেশি নিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, হুকুমনির্ভর সরকারি সংস্থাগুলি যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে ব্যর্থ। সকল ব্যবস্থাপনার মৌলিক শর্ত হল সুপরিকল্পিত পুরস্কার-তিরস্কার কাঠামো। সাধারণত, বেসরকারি ক্ষেত্রে এই কাঠামো রাখা হয়, কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রে এটি প্রায় অনুপস্থিত।

চীনে (এবং রাশিয়ায়) করায়ত্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য হুকুমনির্ভর ব্যবস্থাপনা থেকে উৎসাহ-বা পুরস্কার-নির্ভর ব্যবস্থাপনায় সরে আশার প্রশংসনীয় চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে চীনের কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলা যেতে পারে, কারণ এ ব্যাপারে চীন রাশিয়ার তুলনায়

অনেক বেশি অগ্রসর এবং চীনের কাছ থেকে ভারত বহু জিনিস শিখতে পারে। চীনে সংস্কার প্রবর্তনের এক দশক বাদে—অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের শেষে—নানা ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের স্থান অধিকার করেছে। অতীতে ১২০টি শিল্পসামগ্রীর সম্পর্কে সরকারের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ১৯৮৮-তে ওই সংখ্যা ৬০-এ নেমে আসে, আবার কেন্দ্রীয় বণ্টনব্যবস্থার আওতাভুক্ত দ্রব্যাদির সংখ্যা ২৫৬ থেকে ২৬-এ নেমে আসে। ওই একই দশকে ব্যাঙ্ক ঋণ মারফত বিনিয়োগের শতকরা হার সমগ্র জাতীয় বিনিয়োগের ২৩·৪ ভাগ থেকে ৬৮·৪ ভাগে বেড়ে যায়, আর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সূত্রে বিনিয়োগের শতকরা হার ৭৬·৬ থেকে ৩১·৬ ভাগে নেমে যায়। দ্রব্যমূল্য, কর, ইত্যাদি বাজার-অর্থনীতির বিভিন্ন প্রকরণের প্রয়োগও ক্রমবর্ধমান।

পুরাতন আদেশভিত্তিক পরিকল্পনাব্যবস্থা থেকে নতুন নিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থায় প্রবেশের মতো অতীব জটিল কর্মকাণ্ডে তেঙ আর তাঁর সহযোগীরা যেভাবে এগিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসার দাবি করতে পারে। সংস্কারের দশকে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে: জাতীয় উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে, বেশ কিছু এলাকায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আশাতীতভাবে বেড়েছে। একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি সহজবোধ্য হবে: পেইচিঙে সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে রঙিন দূরদর্শনযন্ত্র থাকা এখন একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়, যদিও এটা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ছিল সংস্কারের আরম্ভে, অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে।

সংস্কারের ফলে স্বভাবতই চীনে কিছু-কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেমন, মূল্যবৃদ্ধি। কিন্তু এর প্রধান উৎস সংস্কারের অসম্পূর্ণতা এবং আমলাবর্গের লোভ আর অকর্মণ্যতা। আংশিক সংস্কারের ফলে আমলারা এখনও প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী (যদিও সংস্কারের পূর্বে ওই ক্ষমতা আরও অনেক বেশি ছিল); তাঁরা নানাভাবে অর্থের অপব্যবহার করে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন—যেমন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি আমদানি করে, অতিথিশালা নির্মাণ করে, খানাপিনা, উপহার ইত্যাদিতে অপরিমিত ব্যয় করে। তা ছাড়া, আমলারা অনেকেই পুরাতন-নতুন দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকার সুযোগ নিয়ে মুনাফাখোর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যার ফলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, কয়লা আর ইস্পাতের মতো অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দাম রাষ্ট্র কৃত্রিমভাবে অত্যন্ত নীচু মানে বেঁধে রেখেছেন। অনেক আমলা ওই দ্রব্য কম দামে কিনে অনেক বেশি দামে বেসরকারি ক্ষেত্রে, অথবা সংস্কারের ফলে স্বাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি উদ্যোগে বিক্রয় করছেন। তাই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। চীনের নেতৃবৃন্দ অবহিত যে আরও গভীর ও ব্যাপক সংস্কার মারফতই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ ব্যাপারে অতি সতর্কভাবে এবং ঝুঁকি কম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চীনের নেতৃবর্গ যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, ধীরে-ধীরে সংস্কারকে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেলে যে সমস্যা ওঠে, আকস্মিকভাবে পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় পুরোপুরি রূপান্তরের প্রচেষ্টা নিলে ওই সমস্যা অনেক গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে।

প্রসঙ্গত, মনে রাখা উচিত যে, প্রাক-সংস্কার যুগেও চীনে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ছিল, যদিও সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের ফলে তা ছিল প্রচ্ছন্ন, আর সংস্কার-পরবর্তী যুগে দ্রব্যমূল্য আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের ফলে ওই সমস্যা হয়েছে আবরণমুক্ত। সরবরাহে অপ্রাচুর্য এই মুহূর্তে চীনে মৌলিক সমস্যা, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সম্পত্তি-সম্পর্ক ও দ্রব্য-মূল্যের সংস্কারে সংহতি-সাধন, এবং সরকারি উদ্যোগে চুক্তি-দায়িত্বপ্রথার প্রসার ঘটিয়ে জয়েনট স্টক ব্যবস্থার উদ্বোধন। সংস্কারের এক দশক পরে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারিতে দেখা যায়, চীনে বিক্রয়-সামগ্রীর শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগের দামই বাজার দ্বারা নিরূপিত।

তা ছাড়া, পরীক্ষামূলকভাবে যেসব প্রদেশে আর শহরে দ্বৈত দ্রব্যমূল্যব্যবস্থার পরিবর্তে একীভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে যথেষ্ট সুফল মিলেছে।

১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসের একটি আইন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে প্রভূত স্বাধিকার দিয়েছে (যা ভারতের কাছে রীতিমতো শিক্ষণীয়)। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্র যদিও সম্পত্তির মালিক, ওই সম্পত্তির অধিকার ও ব্যবহারে উদ্যোগগুলিকে বিস্তর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেমন, হস্তান্তর, একীকরণ, শেয়ার বণ্টন, পারস্পরিক বিনিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে। তা ছাড়া, এই আইন বহু উদ্যোগকে সরাসরি বহির্বিশ্বের বাজারের সঙ্গে আদানপ্রদানের অধিকার অর্পণ করেছে। সর্বোপরি, নির্দিষ্ট আইনগত নিষেধাজ্ঞা না থাকলে, একটি উদ্যোগের সর্বপ্রকার উৎপাদন / ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমই আইনসিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, এই বিধান উপরোক্ত আইনে থাকায় ওই আইনের উদারনৈতিক ভিত্তি কত গভীর তা সহজেই পরিমাপ করা যায়। স্পষ্টত, এই ধরনের সংস্কার একটি উদ্যোগের পরিচালনাকে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি দেবে, এবং যে-কোনো উদ্যোগের উৎপাদন- ও লাভ-বৃদ্ধির পথে প্রধান একটি অন্তরায়কে অপসারিত করবে।

প্রাক-সংস্কার যুগে একচ্ছত্র আধিপত্যের আস্ফালনে অভ্যস্ত অনেক আমলাই এই সংস্কারগুলির পক্ষপাতী নন। এটি একটি মুখ্য কারণ, যার জন্য চীনে বেশির ভাগ সরকারি উদ্যোগে এখনও সংস্কার চালু করা সম্ভব হয় নি। আশা করা যায় যে, আগামী দশকে সেটা সম্ভব হবে, এবং তখন চীনের মৌলিক সমস্যার—অর্থাৎ সরবরাহে ঘাটতি—দূরীভূত হবে। উৎপাদন এত বেশি বাড়বে যে প্রত্যেকের ভাগেই সন্তোষজনক অংশ আসবে। অবশ্য, বৈষম্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু, স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাক-সংস্কার যুগেও চীনে নানা ব্যাপারে বিপুল বৈষম্য ছিল : যেমন, পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমে অঞ্চলের প্রদেশগুলির মধ্যে কৃষি- বা শিল্প-ক্ষেত্রে বিশাল অসাম্য ছিল। সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মানেও এই অসাম্য ছিল প্রকট : বিশেষত, শহরের তুলনায় গ্রামে জীবনধারণের মান ছিল অনেক নীচু। এটা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক যে, সংস্কার-পরবর্তী যুগে, উলটো ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে : অনেক শহরবাসী দেখছেন যে গ্রামবাসীরা তাঁদের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন।

এটা অনস্বীকার্য যে, উন্নয়নের ত্বরিত গতির ফলে সংস্কারোত্তর কালে বৈষম্য বেশি দৃষ্টিগোচরে হয়েছে। কিন্তু চীনের নানা পত্র-পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়, বৈষম্যের ভিত্তি যদি হয় ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা, পরিশ্রম বা অধ্যবসায়—যদি চৌর্যবৃত্তি বা উৎকোচ ওই ভিত্তি না হয়—তা হলে উপরোক্ত সংকর্মজাত বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো ন্যায়সঙ্গত আপত্তি তোলা যায় না : আর এটা তো মানতেই হবে যে দরিদ্র থাকার চাইতে সম্পদশালী হওয়া অনেক বেশি কাম্য। স্বয়ং তেঙ শিয়াও পিঙ-ই বলেছেন, সমাজতন্ত্র আর দারিদ্র্য সমার্থক নয়। উপরন্তু, মনে রাখা দরকার যে, এখনও পর্যন্ত এমন কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি যার ফলে একসঙ্গে একশত কোটি মানুষকে একই হারে সমৃদ্ধ করা যাবে। বরং চীনে সংস্কারের যুগে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু লোক প্রথমে সমৃদ্ধিশালী হবে, এবং তাদের অনুপ্রেরণায় বা প্রশিক্ষণে অন্যরাও পরে সমৃদ্ধি অর্জন করবে। যদি বৈষম্যের ভিত্তি হয় ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা এবং দায়িত্বশীলতা, তাহলে বিত্তশালিতার বাতাবরণে অসাম্য নিশ্চয়ই দারিদ্র্যে আচ্ছাদিত সমতার চাইতে অধিকতর ইপ্সিত : অন্তত, গভীর অন্ধবিশ্বাস থেকে যাঁরা মুক্ত তাঁরা এই মতই পোষণ করবেন। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত চীনের অধিকাংশ অধিবাসীই সংস্কারের আওতার বাইরে : তাঁদের রোজগার ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বা কাজের ওপর নির্ভরশীল

নয়। এখনও অগণিত সামাজিক খাদ্যভাণ্ড চীনে বিচূর্ণ করা হয় নি (ভারতেও হয় নি)।

সংস্কারকে পূর্ণমাত্রা প্রদান করে চীন সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে উপনীত হতে চাইছে, সেখানে মূলসূত্র হল : রাষ্ট্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আর বাজার হবে বিভিন্ন উদ্যোগের পথপ্রদর্শক। অবশ্য, দেশবিদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বাস্তবে এত জটিল আর পরিবর্তনশীল যে ওই সূত্রের প্রয়োগে অনবরত রদবদল প্রয়োজন হতে পারে, যাতে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা আর সরকারি নিয়ন্ত্রণের যথাযথ সংমিশ্রণ গড়ে তোলা যায়। (এই বক্তব্য অবশ্য চীন বা ভারত, রাশিয়া বা আমেরিকা, যে-কোনো দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।) সাধারণভাবে বলা যায়, সরকারের কর্তব্য এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা এবং বিধিনিষেধ বলবৎ করা যাতে ব্যক্তিগত উৎসাহ, দায়িত্ব আর কর্মদক্ষতা জাগ্রত করা যায়। আর সরকার সেই কাজগুলি করবে যেগুলি করায় ব্যক্তি অক্ষম বা অনিচ্ছুক। তা ছাড়া, আপদে বা সংকটে তো সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। যেমন, যদি কোনো স্বাধিকারভোগী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ অন্যায় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, সরকার তাকে শাস্তি দেবে। আবার, যদি বিনা দোষে উপরোক্ত কোনো উদ্যোগ সংকটে নিমজ্জিত হয় (উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রত্যাশিত ও ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে), তাহলে সরকার তাকে রক্ষা করবে। উপসংহারে বলা যায়, একটি দেশে সর্বাধিক উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও নির্মাণের প্রচেষ্টা বিরামবিহীনভাবে চলা উচিত ; (ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক) কোনোরকম ভ্রান্তবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে এই চেষ্টাকে ব্যাহত করা অনুচিত।

‘গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মতো’

বিজিতকুমার দত্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের গোত্রবিচারপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা”র কথিকাগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে। প্রবাসীতে প্রকাশিত “শুধু কেরানী” (১৯৩০) প্রেমেন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প। লিপিকার কথন-ভঙ্গি এই গল্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লিপিকার অনুকরণ অন্যেরাও করেছেন। যেমন “সবুজপত্রে”র লেখক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সুরেশচন্দ্র আবেগতপ্ত বলে ভাষায় আরও বেশি মগ্নতা। লিপিকার গাঢ়তা ঈষৎ ব্যাহত তাঁর ছোটোগল্পের ভাষায়। তিনি যেন একটু বেশি বিগলিত। ১৯২২ সালে লিপিকা প্রকাশিত হওয়ার পর “কল্লোল” (১৯২৩) বেরিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়েছে। রোধ-করা পথের থেকে সরিয়ে দিয়ে চলতিপথের পথিক যাঁরা এলেন প্রেমেন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। “শুধু কেরানী” দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা যাবে না যে তিনি রবীন্দ্র-অসহিষ্ণু, বিরোধের কথা তো উঠছেই না। এইখানে প্রেমেন্দ্রের বুদ্ধিবিবেচনা নির্ভুল। প্রেমেন্দ্র দাঁড়াবার জায়গাটি ঠিক বেছে নিলেন।

“শুধু কেরানী” কথিকা এই কারণেই যে গল্পটি বিবৃতিধর্মী। আবার “ঘাটের কথা” অথবা “রাজপথের কথা”র মতো মনে হয় না। নায়ক-নায়িকার অসহায় আর্ত চরিত্র চকিত হয়ে উঠেছে এই গল্পে। ভালোবাসার সমর্পণ যে কত করুণ হতে পারে, ভাষায় তা সঞ্চারিত হতে দেরি হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কথিকায় যেমন ভৈরবীর সুর, প্রেমেন্দ্রের গল্পেও সেই ভৈরবীর ইশারা এবং ইঙ্গিত। এই গল্প সরলরৈখিক। রোমানটিক বেদনার মাধুর্য প্রেমেন্দ্রের বয়সের ধর্মে অনিবার্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এই গল্পকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের “কথিকা”য় স্মৃতিচারণা আমাদের মগ্ন করে, কখনও-কখনও গ্রাস করে। সেই টনটনে ব্যথা প্রায় অসহ্য। প্রেমেন্দ্র সেই ব্যথাপ্রকাশের কৌশল আয়ত্ত করে-ছিলেন কিনা—এই প্রশ্ন অবান্তর। প্রেমেন্দ্র মধ্যবিত্তের আটপৌরে জীবনের একটা মণ্ডল তৈরি করে নিলেন। আটপৌরে স্বভাবকে তিনি স্পর্শ করতে চাইলেন।

[প্রেমেন্দ্র মিত্রের একগুচ্ছ গল্প আর-একবার পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন নাভানা প্রকাশন। এই গল্পগুলি পড়ার পর এমন কিছু কথা মনে এল যা গ্রন্থসমালোচনার ছোটো পরিসরে গুছিয়ে বলা সম্ভব ছিল না। একটু বিস্তৃত পরিসরে আমাদের তৃপ্তিটুকু নিবেদন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন পত্রিকা - সম্পাদক। প্রেমেন্দ্র-রসিক সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।]

স্বামীর পয়সা বাঁচিয়ে মালা কেনা এবং স্ত্রীর ছদ্মকোপ অথবা অফিসে কেরানির হিসেবপত্তর দেখাশোনা, ডাক্তারের খরচ, অভাব-অনটন—সবই আলতোভাবে ছুঁয়ে গেছে গল্পের মণ্ডলে, অথবা ভালোবাসার গায়ে। গল্পের শ্বাস কিন্তু সেখানে নয়। ভালোবাসার করুণ-মধুর রূপই গল্পের মর্ম। প্রেমেন্দ্রের গল্পে নিয়তির চাপ নেই জগদীশ গুপ্তের গল্পের মতো। রবীন্দ্রনাথের থমথমে ভাবনারও বিস্তার নেই, আছে কেরানির জীবনের আর্তনাদ। যা নিয়তি নয়, অর্থনৈতিক পীড়নের অনিবার্যতা, এও নিয়তি। তবে দেবতার দেওয়া নয়, শোষণের যন্ত্রদেবতার চাপ। ১৯৩০-এ লেখা “পুন্নাম” গল্পও কেরানি-জীবনের। কিন্তু কেরানির দিনগত পাপক্ষয়ের চিত্র সরিয়ে রেখেছেন কিছুটা আড়ালে। টুকটাক ছুঁড়ে দিয়েছেন এদিকে-ওদিকে কয়েকটা লাইন কেরানিকে কেন্দ্র করেই। এই গল্পে অভিযোগ আছে। বোধ করি অভিযোগটাই তীব্রতা পেতে-পেতে সুচীমুখে এল কেরানির টাকাচুরির বৃত্তান্তে। কুচুটে ছেলের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসে যখন একটি শিশু-ভোলানাথের করুণ মৃত্যুর মুখোমুখি হল তখন নায়কের কাছে এই অসাম্য বড়ো হয়ে বেজে উঠল। ভালোবাসা, মমতা, স্নেহের নিষ্ঠুরতার মুখটা আমরা দেখতে পেলাম। কিছুটা “পুতুলের সংসার”-কে মনে পড়বে আমাদের। প্রেমেন্দ্র ছোটো পরিসরে ভিন্ন রসে ঢেলেছেন ছবি-ললিত-খোকা-টুনুর গল্পকে। গল্পের শেষে প্রেমেন্দ্র একটু উদাস হয়ে যান। সংসারের গোলকধাঁধা তাঁকে বড়ো অস্থির করে তোলে। তিনি বলেন, ‘বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই তলায় তার [ললিতের] মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ’রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হ’য়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি।’ এই বোধোদয় মধ্যবিত্তকে বাঁচিয়ে রাখে। ললিত ঝেড়ে ফেলতে পারে। ললিতরা সংসারের এই ডিজাইনের মধ্যে বেঁচেবর্তে থাকে। এ গল্প, মনে হতে পারে, প্রতিবাদহীনতার গল্প। কিন্তু প্রেমেন্দ্র যখন ‘বিশাল আকাশে নক্ষত্রের আলো’কে দেখান তখন আমাদের অস্বস্তি হতে থাকে। এক রকমের ক্ষোভ জমা হতে থাকে আমাদের। প্রথম গল্পে অভাব-অনটনের প্রতি, দ্বিতীয় গল্পে আমাদেরই মরচে-পড়া স্বভাবের প্রতি।

প্রেমেন্দ্র বলেছেন, ‘সব গল্পেরই আরম্ভ মাঝখান থেকে ; কোথায় গোড়া, কোথায় গল্পের সে রহস্যময় মূল অন্ধকার মাটির রহস্যময় গর্ভে ? কে সেখান থেকে তাকে তুলে আনতে পারে, কে তার শাখাপ্রশাখা সহস্র বাহুর সন্ধান রাখে ? গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মতো বয়ে, তার মাঝের খানিকটা ধরি মাত্র। মাটির রহস্য আর আকাশের ইশারা মানুষের জীবনে।’ রহস্য আর ইশারার নানা রঙ, নানা পরিবর্তন। প্রেমেন্দ্র সেই পরিবর্তন আর রঙের কোনো একটা অংশকে গল্পে তুলে আনেন। “কুয়াশায়” নামটাই তো সেই রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। আবছা পরিবেশে জীবনের চলচ্চিত্র উদ্ভাসিত হয় যেভাবে। মধ্যবিত্তের গতানু-গতিক জীবনের মধ্যে বুদবুদের মতো ভেসে ওঠে কামনা আর বাসনা, যা ছিল প্রেমেন্দ্রের ভাষায় মাটির গর্ভে। বিধবা সরমার ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ দেখা গেল ‘ভাগ্যের অভিশাপে একান্ত প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে যে-বীজ চিরদিন নিজের মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারত, তাই দেখা যায় একদিন কোথাকার এতটুকু ইঙ্গিতে ও আশ্বাসে হঠাৎ পল্লবিত হ’য়ে উঠেছে।’ প্রেমেন্দ্র বুঝে নেন, এখানেই সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। ‘ভাগ্যের অভিশাপ’-কে সরিয়ে দিতে চাইলেও মানুষ তা পারে না। ললিত খোকার ভালো চাইলেও সে খোকা মরে যায়। অথবা ছেলেটি প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চাইলেও মেয়েটি ‘ফুরিয়ে’ যায়। প্রেমেন্দ্র দেখতে পান ‘তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরন আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।’ নীড়ভাঙা, হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়া, বিবর্ণ ঘাসে সরমার চিতাদৃশ্য আমাদের ব্যাকুল করে তোলে। খুবই স্বাভাবিক যে প্রেমেন্দ্র ভাগ্যের জমিকে ভুলতে পারছেন না। কিন্তু প্রথম দুটি গল্পে

মানুষ কতটা নিষ্ক্রিয়। খুব ছোটো হয়ে এসেছে মানুষের জগৎ। ভালোবাসা আর স্বার্থ কৃপণের মতো লুকোচুরি খেলেছে "পুন্নাম" আর "শুধু কেরানী" গল্পে। কিন্তু কুয়াশায় ভাগ্যের বিরুদ্ধে যাবার ধাক্কাটা তীব্র। পাঠককে ঝাঁকিয়ে দেন প্রেমেন্দ্র। আগের দুটি গল্পে পাঠক গল্পের মর্মে পৌঁছে রোমন্থন করতে থাকে, তৃতীয় গল্প পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়। অদৃশ্য ফাঁসটা যে তার চোখের সামনে ছিল না। ফাঁসটা যখন কাঁটার মতো বিঁধল সরমাকে তখন পাঠকের ভাববার সময়টুকুও প্রেমেন্দ্র দেন না। চোরা গলি-ঘুঁজিগুলো পেরিয়ে টান দিয়ে নিয়ে আসেন বিবর্ণ ঘাসের জমিতে। অথচ নরেনের ভালোবাসার দুই কোটিতে বিচরণকে আমরা বিশ্বাসঘাতকতাও বলতে পারি না। নরেন সম্ভবত হঠকারিতাও করে নি। গোবিন্দলাল-রোহিণীর বিংশ শতাব্দের কাহিনী কি এইরকম? অসংখ্য প্রশ্নে প্রেমেন্দ্র আমাদের নিক্ষেপ করেন। আসলে "কুয়াশা"-য় তো সব দৃশ্য হয় না। আর অদৃশ্য মনোজগৎ সম্বন্ধে প্রচণ্ড একটা কৌতূহল জাগিয়ে প্রেমেন্দ্র গল্প শেষ করেন। বস্তুত, প্রেমেন্দ্র এই কুয়াশা-র রহস্যই হেডলাইট জ্বালিয়ে দেখতে চান। "হয়তো", "শৃঙ্খল", "তেলেনাপোতা আবিষ্কার", "স্টোভ" গল্পগুলোতে প্রেমেন্দ্রের অন্বেষা অনেকটা এইরকমই।

"হয়তো" প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ক্ষুধিত পাষাণ"। গল্পটি "পুতুল ও প্রতিমা" গল্পগুচ্ছে স্থান পেয়েছিল। "পুতুল ও প্রতিমা" (১৯৩২) নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুতুলনাচের ইতিকথা"র কথা মনে পড়তেই পারে। মানিক পুতুল কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেবতার হাসিকেও তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন নি। মানুষ যে সূত্রধারের হাতের পুতুলের ভূমিকায় অভিনয় করছে, প্রেমেন্দ্র এবং মানিক দুজনেই তা দেখিয়ে দেন। মানিক বড়ো পরিসরে সূত্রধারের হাতে পুতুলগুলো কী যন্ত্রণায় মাথা কুটে মরছে, তার চিত্র এঁকেছেন। কথাসাহিত্যে প্রেমেন্দ্রই কথাটি আগে ব্যবহার করেছেন। প্রেমেন্দ্র সতর্ক হয়েছেন মানুষকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে। মানুষ পুতুল, কিন্তু পুতুল হয়ে সে থাকতে চায় না। তার ভেতরে চলছে বন্ধনকে ভাঙবার প্রেরণা। যে সংস্কার তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে, তার সুতো সে ছিঁড়তে চাইছে। "হয়তো" গল্পে মহিমের পোড়ো ভাঙাবাড়ির মধ্যে বাস করছে পিসিমা আর মাধুরী। একজন বৃদ্ধা গল্পলেখক নাথানিয়েল হথর্নের বৃদ্ধা এস্থার ডাডলির মতো, অন্যজন এই বাড়ির অভিশাপরূপে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। তার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রতিবাদ। "ক্ষুধিত পাষাণে"র নারীদের মতোই সে রঙ্গিণী—আবার অধরা, অধরা মাধুরী। লাবণ্যকে নিয়ে মাধুরী যখন অন্ধকার ঘরে ঢুকে বাক্সের পর বাক্সের থেকে একটা বাক্স নামিয়ে খুলে ফেলল তখন 'তালা খুলিয়া সে প্রথমেই যে-জিনিসটি বাহির করিয়া আনিল, অন্ধকারেও তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লাবণ্য চমকাইয়া উঠিল। সে-কালের জড়োয়া গহনা! লাবণ্যের মনে হইল, অন্ধকারে তাহার মূল্যবান পাথরগুলি হিংস্র সরীসৃপের চোখের মতোই যেন তাহার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লাবণ্যের বুকের ভিতরটা অকারণ ভয়ে শুকাইয়া আসিতেছিল।' আর এই সময়ে ডাইনির মতো প্রাণহীন প্রস্তরের অস্বাভাবিক জ্যোতির প্রখরতা নিয়ে পিসিমা সেখানে উপস্থিত হল। লাবণ্য 'মাগো' বলে চীৎকার করে উঠল। "ক্ষুধিত পাষাণে" রাত্রির হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের প্রাণহীন প্রখরতা, প্রেমেন্দ্রও অন্ধকারে জড়োয়া গহনার হিংস্রতা আর পিসিমার ডাইনি চোখ তুলে আনেন। দুই বর্ণনার মধ্যেই রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার অনুভূতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ, সমাসযুক্ত শব্দের ঝঙ্কারে যে নিক্কণ তোলেন, প্রেমেন্দ্রের বর্ণনায় তার অভাব। প্রেমেন্দ্র বাস্তবের কঠিন শীতলতাকে স্পর্শ করতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ রোমানটিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে অতীতের ঐশ্বর্যের আড়ালে ক্ষুধার বিরাট রূপকে এঁকেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র পোড়ো বাড়ির মধ্যে একটি নারীর মধ্যে সেই যন্ত্রণাকাতর অথচ রঙ্গময়ী রূপকে প্রতিমারূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ বাড়ির ছেলে মহিমের আচরণের দোলাচল রূপ আর মাধুরীর আকস্মিক আবির্ভাব আর অন্তর্ধান—দুইই একই পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে। মহিমের নারী সম্পর্কে অবিশ্বাস আমরা বুঝে নিতে পারি তার বংশেরই উত্তরাধিকার। জমিদারের রক্তে ব্যভিচারের বিকৃতি মহিমকে গ্রাস করে ফেলেছে। সে নিজেও বহন করে চলেছে পাপ। কিন্তু প্রেমেন্দ্র এই পুতুলটিকে প্রতিমাতে রূপান্তরিত করেন। মহিমও বেরিয়ে আসতে চায়। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। মহিম লাবণ্যকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার রক্তের মধ্যে খেলা করে পাপ। সে লাবণ্যকে নিয়ে সারাদিন ভালোবাসাবাসি খেলা করে। যখন সে নিজেকে ফিরে পেতে চাইছে, তখন তার চোখে ফুটে ওঠে অদ্ভুত দৃষ্টি। লাবণ্যকে বুকে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই: 'কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ! তাহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্তটিকেই চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কি? এই সন্দেহের দোলা হইতে, চিরদিনের মতো রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।' মহিমের প্রশ্নের মধ্যে মহিমকে চেনা যায় সহজে। যে স্বপ্ন তার লুপ্ত হয়ে যায়, তাকে সে অমর করে রাখতে চায় লাবণ্যকে খুন করে। 'মৃত্যুর মধ্যে অমর' করে তুলতে চায় সে প্রেমকে। বলা বাহুল্য, এ বিকৃতি। মহিমের জীবনে অভিশাপও। কেবল লক্ষণীয় এই যে, পূর্বপুরুষের শৃঙ্খলাকে সে ভাঙতে চাইছে। এখানে সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। পুতুল থেকে প্রতিমার ধর্ম সে পেয়ে যায়। কিন্তু "ক্ষুধিত পাষাণে"র মেহের আলির মতোই পাষাণ-রাক্ষসের মোহ সে কাটাতে পারে না।

"তেলেনাপোতা"ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষুধিত পাষাণ। "হয়তো" গল্পের সাতমহলা দালানের অবশিষ্ট কিছু নেই। ভাঙা নোনাধরা ইটকাঠের স্তূপ, ভুতুড়ে পোড়া বাড়ি এখন সেটা। জরাজীর্ণ বাড়িতে কোনো মুমূর্ষু প্রাণ ধুকধুক করছে কিনা বোঝা যায় না। আর তেলেনাপোতার বাড়িও বিশালায়তন, জীর্ণ অট্টালিকা। ভাঙা ছাদ, ধসেপড়া দেয়াল, চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা। "হয়তো"-র বাড়িও যেমন অভিশপ্ত, তেমান ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে-থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের মধ্যে সমস্ত রাত বিবাদ করবে। "কুড়িয়ে ছড়িয়ে" (১৯১৬) গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত এই গল্পটি মহিমের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিলেও স্বাদে গুণে এককথায় আবেদনে ভিন্নজাতীয়। ক্ষুধিত পাষাণের প্যাটার্ন নেই। অথচ পাষাণ-প্রস্তরের রাক্ষসীমায়া এই গল্পেও রয়েছে। প্রেমেন্দ্র তেলেনাপোতায় পাঠকের সঙ্গী হতে চান। ক্ষুধিত পাষাণের প্রাসাদের আলো-ছায়ায় সুন্দরীদের আনাগোনা। দেয়ালে-দেয়ালে ব্যর্থ সুখের আর্তনাদ, ছায়াময় নারীদের নূপুরধ্বনি। বিলাস-ঐশ্বর্যের প্রবাহ। কতকটা মোগল-নবাবের অন্তঃপুরের খোজাবেষ্টিত জেব-উন্নিসা উদিপুরীর ছলনা, চতুরতা, ঈর্ষা, জিঘাংসার সঙ্গে তুলনীয় ক্ষুধিত পাষাণের প্রাসাদ। আর এসব নিয়ে এবং তাকে ছাড়িয়ে তীব্র আকর্ষণের মায়াজাল। বলা বাহুল্য, প্রেমেন্দ্র যখন গল্প লিখেছেন তখন সেকালকে এভাবে আয়ত্তে আনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রেমেন্দ্রও তেলেনাপোতার ভাঙা বাড়ির রহস্যসন্ধানী। গোটা বাড়িটাতেই ভৌতিক আলোছায়া। কিন্তু সবকিছুই নরম হয়ে আসে প্রেমেন্দ্র যখন ছোটো পুকুরের ধারে আমাদের নিয়ে যান। পানাভরা সেই পুকুরের বাইরের

এবং ভেতরের পরিবেশে আর-একরকমের টানটোন। সেখানে ক্ষুধিত পাষাণের বেগম নেই, আছে যামিনীর কলসি নিয়ে ঘাটে আসার দৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের চন্দননগরের বাড়ির নিস্তব্ধ দুপুরে ঘাটে এসে বসার পর যে উপলব্ধি হয়েছিল, পাঠকও সেইরকম কিছু একটা অনুভব করে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র কেবল প্রকৃতিতে সমর্পণকেই বড়ো করে দেখান না। ওই ডোবায় উড়ে-আসা মাছরাঙা পাখির ব্যঞ্জ পাঠককে সচকিত করে। আর সমস্ত পরিবেশের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় যখন একটি উচ্চারণ 'টান দিন' আমরা শুনতে পাই। ক্ষুধিত পাষাণের নারীরা লোভায়, ভোলায়, তারপর মিলিয়ে যায়। তেলেনাপোতার মাছেরাও জলে ছলনার জাল পাতে। ছিপধারীকে লোভায়, ভোলায়, তারপর সরে পড়ে। এ মায়া কদিন থাকে, এ মোহ মিলায়। কিন্তু ক্ষুধিত পাষাণের সম্মোহনের ছক তেলেনাপোতায় তুলে আনেন আর-এক ভাবে। প্রেমেন্দ্রর গল্প আসলে রূপকথা। রূপকথার রাজকন্যা যামিনী। প্রেমেন্দ্র আধুনিক মধ্যবিত্তের মানসিকতার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন রূপকথার পরিবেশকে। মধ্যবিত্তের হাতে সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি নেই। শত কষ্ট সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত বেঁচে থাকে তার মনকে নিয়ে। সে মন অভাব-অনটন সত্ত্বেও উপেক্ষিত, পীড়িতকে সহানুভূতি জানায়। সেখানে সে উদ্ধারকারীর ভূমিকা নেয়। রূপকথার রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনে রাজপুত্র। একালের রাজপুত্র মধ্যবিত্ত। যামিনীর পরিবেশে দারিদ্র্যের ছাপ। প্রেমেন্দ্র যামিনীর মা-কে চিত্রিত করেছেন একটি ছত্রে: 'একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্ন-কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে।' আর যামিনী? 'তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।' পাঠকও পাথর হয়ে যায় নিশ্চয়ই, আর সেই মুহূর্তেই যামিনীকে উদ্ধারের বাসনা জেগে উঠবে। প্রেমেন্দ্রের এই সংকলনের গল্পগুলিতে মধ্যবিত্তের বিজয়ীর ভূমিকা নেই, বলেছেন সুব্রত নিয়োগী। কিন্তু মধ্যবিত্তের বিজয়ীর প্রকাশ "তেলেনাপোতা আবিষ্কার" গল্পে। একালের রূপকথায় বাস্তবতাকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রেমেন্দ্র বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষাকে। আর প্রেমেন্দ্র, বোধ করি, এই কথাই বলতে চেয়েছেন তেলেনাপোতা অভিযানে, এবং রাজকন্যা উদ্ধারের বাসনা আমাদের সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতোই সেই সংস্কার জেগে উঠবে, আবার মিলিয়ে যাবে। একালের বন্দী রাজকুমারেরা স্বপ্ন আর বাস্তবের টানাপোড়েনে কেবলই ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে।

মধ্যবিত্তের মনোজগতের জটিলতা প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্রের "শৃঙ্খল" গল্পে। ভূপতি-বিনতির দাম্পত্য জীবন আপাতদৃষ্টিতে নিশ্ছিদ্র, নিষ্কণ্টক। ১৯৩০-এ প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন নীড়ভাঙার ইতিহাস ("শুধু কেরানী")। তার আট বছর পর প্রেমেন্দ্র মধ্যবিত্তের আরও সূক্ষ্ম জটিলতাকে স্পর্শ করলেন। দারিদ্র্যকে দেখেছিলেন তিনি তখন বাইরে থেকে, এবারে দারিদ্র্য নয়—দাম্পত্য প্রেমের এক করুণ আর গ্লানিময় দিকের উদ্‌ঘাটন করলেন ভেতর থেকে। ভূপতির এলোমেলো আচরণে কেবল বিনতিই আশ্চর্য হয় না, পাঠকও সংশয়ের দোলায় আন্দোলিত হয়। "হয়তো"র মহিমের মতোই সে ভালোবাসে, আবার মহিমের মতো ঠিক নয়, তার কাছাকাছি সেও স্ত্রীকে পীড়ন করে। পাশাপাশি শুয়েও তাদের মধ্যে থাকে ব্যবধান। বিনতিও ভূপতির সঙ্গে থাকতে-থাকতে কাজ-চলা গোছের একটা সমঝোতা বার করে নেয়। এখানেই দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজেডি। প্রেমেন্দ্র দাম্পত্যশৃঙ্খলে পিষ্ট মানুষের আর্তনাদ পরিস্ফুট করেছেন এই গল্পে। তাঁর কথায় 'তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল—জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।' প্রেমেন্দ্র ছোটগল্পে যে প্রশ্ন নিক্ষেপ করেছেন তা আমাদের নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। কল্লোলগোষ্ঠীর কিছু লেখক প্রেমের রোমানটিক আবেগঅনুভূতিকে বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র উতলা রজনীকে অন্য এক অন্ধকারে পৌঁছে দিয়েছেন। রজনী নয়, বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণার টানাপোড়েন। এই টানাপোড়েনে যে বিষ ছড়িয়ে যায় তা প্রেমের চাইতে উন্মাদনাকর। সত্যিই কি তাই? এখানে কি কোনো বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত আছে? এই প্রশ্নগুলির সামনে আমরা বিচলিত হই। আধুনিক মনের কাছে এর আবেদন সব দিক থেকেই। আমাদের মনে হয়, ভূপতি প্যাথলজিক্যাল চরিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে ফ্রয়েডের সমীক্ষণ-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। ভূপতির চরিত্রও বিকৃত। কিন্তু মহিমের বিকৃতির কারণ খুঁজে পাই না। কেবল এইটুকু বুঝি ভূপতি-বিনতি উভয়েরই চিত্তে ঘৃণা আর ভালোবাসা বাস করছে। ফলে বিচ্ছেদ। উভয়েরই বইতে হচ্ছে 'নিঃশব্দতার ভার'। প্রেমেন্দ্র মন্তব্য করেন, 'এ নিঃশব্দতার নির্বাসন তাহাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছে।' সাম্প্রতিক কালের বিচ্ছিন্নতার বেদনার সঙ্গে একই মাত্রায় এ 'নির্বাসনকে' স্থাপন করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখার বিষয়। কিংবা প্রেমেন্দ্র কি মানুষের মধ্যে জান্তব কোনো বস্তুর ইশারা পান। শুধু বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা থেকে মানুষ যে লড়াই করে চলেছে আধুনিক ভদ্রতার মুখোশে তা ঢাকা পড়ে যায়। প্রেমেন্দ্র সে মুখোশটা খুলে দিতে চান? বস্তুত, এক ধরনের দ্বিধা আর জড়তা আর নিষ্ঠুরতাকে বর্জন করেই চলেছিলেন লেখকবন্দ। কেউ-কেউ হয়তো ভয়ও পেয়েছেন। জীবনের এলিমেনটাল রূপটা ভদ্রতার কাছে স্থূল, অশ্লীল আর ঘৃণ্য। সাহিত্যে জেকিলকেই পাচ্ছিলাম আমরা। মি. হাইড প্রচ্ছন্নই ছিলেন। প্রেমেন্দ্র এই গল্পে জৈবিক, স্থূল, অশ্লীলকেই তুলে এনেছেন। মাঝারি গল্পলেখকের মতো প্রেমেন্দ্র কিন্তু অস্থির চপল হয়ে ওঠেন না। বিদ্রোহের মধ্যে কিছুটা উচ্ছ্বাস থাকেই। কিন্তু তা যখন শিল্পের ফ্রেমে বাঁধা পড়ে, তখন লক্ষ্য নির্দিষ্ট, একমুখী। "শৃঙ্খল" গল্পের দৃশ্যের টুকরোগুলিও সেই বন্ধনের শৃঙ্খলে প্রবাহিত হয়েছে। অস্থিরতা আর চপলতা সাময়িকতাকেই প্রশ্রয় দেয়। প্রেমেন্দ্র তা জানতেন। "স্টোভ" সরল গল্প। স্টোভ প্রতীক কোনো সন্দেহ নেই। দুই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প এটি। স্বামীর পূর্বপ্রণয়ী মল্লিকার কাছে বাসন্তী কিছুতেই পরাজয় মেনে নেবে না। কখনও-কখনও মনে হয় বাসন্তীর আশঙ্কা অহেতুক। শশিভূষণ সেই জাতের পুরুষই নয়। মল্লিকার সঙ্গে তার নূতন করে সাক্ষাতে বিপদের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বাসন্তীর বাসনায় ঘুমিয়ে-পড়া ঈর্ষা জেগে উঠলই। একটা ইঙ্গিতেই প্রেমেন্দ্র তা যুটিয়ে তুলেছেন, 'মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন ক'রে চারিধারে ফণা তোলে।' আগুন আর সাপ বিধ্বংসী এই দুটি দৃশ্য গল্পের অন্তঃনীলা স্রোত। রবীন্দ্রনাথের কথিকার স্বীকরণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এইভাবেই উদ্‌ভাসিত হয়। বাকসংযমের এই নির্মম রীতি গল্পকে উঁচুসুরে বেঁধে রাখে। বলাবাহুল্য, বিষয় এমন কিছু নূতন নয়, কিন্তু সামান্য বিষয়ও অনেক সময় 'উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন' করে। প্রেমেন্দ্র বিচিত্র মানুষের বাসনালোক অনুধাবনে সচেষ্ট। স্টোভটা বহুদিন পড়ে আছে। বাসন্তীর ঈর্ষাও বহুদিন অদৃশ্যলোকে ঘুমিয়ে আছে। অনুকূল পরিবেশে একদিন সে গর্জন করে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই কি ঠিক? যেখানে তিনি বলেছেন বিষবৃক্ষের বীজ আমাদের ঘরের সামনেই রয়েছে? "জনৈক কাপুরুষের কাহিনী" গল্প "কুড়িয়ে ছড়িয়ে" (১৯৩৭) গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখানে প্রেমেন্দ্র বলেই দিয়েছেন "কাপুরুষের কাহিনী"। জনৈক বিশেষণটিও লক্ষণীয়।

তুচ্ছতাচ্ছিল্যের রঙে ঘেরা শব্দটি। প্রেমেন্দ্র মধ্যবিত্তের আর-একটা শেকড়কে তুলে আনেন। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে বোতামআঁটা শান্তিতে শয়ান বাঙালিকে দেখেছিলেন ("দুরন্ত আশা", "মানসী")। সেই মধ্যবিত্তেরই চেহারা ফুটে উঠল 'জনৈক' পুরুষের চিত্রচরিত্রে। এখানেও নারী সক্রিয়। তবে শশিভূষণের মতো শীতল নয় 'জনৈক যুবক'। মাঝে-মাঝে করুণার নিবেদনে চঞ্চল হয়েছে সে। কিন্তু সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। মধ্যবিত্তের রক্তের চঞ্চলতাকে তার ভয়। 'ভাগ্য' 'নিয়তি'-কে সে স্মরণ করেছে। আর অন্তিম মুহূর্তে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু করুণা পূর্বপ্রণয়ীকে তাড়িয়ে দিয়েও কেন আবার স্টেশনে তার কাছে ছুটে এল, এর কোনো জবাব আমরা পাই না। গল্পে এক জায়গায় করুণার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ উচ্চারণকে যদি গ্রহণ করি তবে কুয়াশা খানিকটা কেটে যায়। করুণা তার স্বামীকে বলেছিল, বিবাহের 'আগে কুড়ি বছর আমি সলিটারি সেলে ছিলাম মনে করো।' করুণার কোলিয়ারিতে নির্জনবাস এক ধরনের সলিটারি সেলেই বাস। তারই ইঙ্গিত পাই এখানে। সুতরাং করুণার ছুটে-আসার মধ্যে আন্তরিকতা থাকাই সম্ভব। তবু সংশয় থেকেই যায়। প্রেমেন্দ্রের গল্পে এই সংশয় একটা বড়ো উপাদান—সুব্রত নিয়োগী ঠিকই বলেছেন। 'জনৈক' যুবকের কাপুরুষতা মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন করে দেন প্রেমেন্দ্র। মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিকতায় শাসিত মানুষের চেহারা প্রকাশিত এইখানে। কাপুরুষের সাস্ত্বনা সমাজের শাসনকেই চিনিয়ে দেয়, 'যে-ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুরু করব।' "ভবিষ্যতের ভার" গল্পটি কোন্ সময়ে প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন জানি না। গল্পটি সাধারণ মাপের। শিক্ষাজগতের শিক্ষক ও ছাত্রের এবং পরিচালকবর্গের দুঃসহ অবহেলা। উদাসীন্য এবং যান্ত্রিকতাকে তুলে ধরেছেন প্রেমেন্দ্র। এও মধ্যবিত্তের কাহিনী। মধ্যবিত্তের স্বপ্নচ্যুতির গল্প। মেনে নেওয়ার, গতানুগতিকতার ফাঁকে আটকেপড়া মধ্যবিত্তের করুণ কাহিনী এটি। "লেবেল ক্রসিং" "সালঙ্কারা" (১৯৬৬) গল্পসংকলনে স্থান পেয়েছিল। মধ্যবিত্তের কাহিনী এটি নয়। প্রেমেন্দ্র দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কনে নিপুণ। রুইদাসের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীর ছবি প্রেমেন্দ্রের ভাষায় 'সংসার বলতে অবশ্য এখন তার রুগ্না স্ত্রী রাখালী, সেও একটা ছাগলী'। রাখালী ও ছাগলী অনুপ্রাসের টানে এসেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্যই স্বীকার করে না বর্তমান অর্থনীতি। প্রেমেন্দ্র রুইদাসের সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তের পরাজয়বিধি বারে-বারে দেখেন, তিনি কিন্তু শ্রমিকের মধ্যে পেয়ে যান স্থূল, তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের শপথ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি। সাধন ডাক্তার, নরহরি মালি আর কামাখ্যা ডাক্তার রুইদাসের আচরণে পেয়ে যায় বেঁচে থাকার স্বাদ। প্রেমেন্দ্র বলেন 'তারা যেন এইটুকু আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেছে যে, মাথাটা উঁচু করে রাখবার জন্যেই ঘাড়ের ওপর বসান, মাটিতে লুটোবার জন্যে নয়।' এ গল্প বাঙলা সাহিত্যে এখন পুরনো মনে হতে পারে। প্রেমেন্দ্রের আগেই এরকম বিষয় বাঙলা ছোটোগল্পে জায়গা পেয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রেমেন্দ্রের গল্পে যে অনিবার্যতা আছে, তার যে অনায়াস পরিণতি আমরা লক্ষ করি, সেইরকম ভাবে ঠিক এখনকার এইজাতীয় গল্প এগোয় না। ইচ্ছাপূরণের কথা আছে এই গল্পে কিন্তু ছকেবাঁধা এই গল্প নয়। প্রেমেন্দ্রের বিদ্রোহে উত্তেজনা আছে, কিন্তু তিনি বড়ো মাপের কিছু খুঁজে পান না রুইদাস এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে। প্রেমেন্দ্রের সমসাময়িক হয়েও যাঁরা একালের গল্পলেখক তাঁরা এই বিস্ফোরণের মধ্যে কিন্তু আবিষ্কার করেন মানুষের রাগী আর-এক সত্তার। একসময়ে "মহানগর" গল্পটি প্রেমেন্দ্র

মিত্রের নামী গল্পগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এমন কিছু গল্প থাকে যেখানে পাঠকের মনোযোগ সময়-সময় বিচলিত হতে থাকে। "মহানগর" গল্পে রতন আর চপলা ভাইবোনের প্রতি আমাদের মনোযোগ সেইরকমভাবে বিচলিত হয়। একবার রতন আর একবার দিদি চপলা আমাদের বিহ্বল করে তোলে। বলা বাহুল্য, এই দুই যদি সমান্তরালে চলতে থাকে তবে গল্প কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। চপলার পতিতা জীবন এবং গ্রাম্য বালক রতনের দিদিকে উদ্ধারের আগ্রহ—দুইই পিষতে থাকে পাঠককে। শেষ পর্যন্ত কোন্ বিন্দুতে মিলতে পারে এই দুই আকর্ষণ? আমাদের মনে হয়, ভ্রাতা ও ভগ্নীর যে ভালোবাসা, তা-ই এই গল্পের প্রধান আকর্ষণ। দিদির পতিতাবৃত্তি এই গল্পে আছে ঠিকই এবং তার উপর সমাজশাসনের (অর্থনীতির দুর্নীত) চাপ যথেষ্টই অনুভব করি, কিন্তু সব কিছু মিলে যায় ওই ভালোবাসার বিন্দুতে। ভাইকে পেয়ে চপলার অশ্রু, রতনকে যত্ন করা, বাপের বাড়ির তত্ত্বতালাস করা, সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ভাইকে ঠেলে দেওয়া—সবই ঐ উৎস থেকে বেরিয়ে আসে। রতনের দিক থেকেও তাই। গল্পটির গঠনে প্রেমেন্দ্র "তেলেনা-পোতা আবিষ্কারে"র বিপরীত ছক গ্রহণ করেছেন। নগর থেকে গ্রামে যাত্রার প্যাটার্ন "তেলেনা-পোতা"য়, আর গ্রাম থেকে নগরে আসার কাহিনী "মহানগর"। এই মহানগর প্রেমেন্দ্রের উক্তিতে 'কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সুচিত্রিত। সেখানে যেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ—সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে—সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে-সংগীতে।' দশপৃষ্ঠার এই গল্পটিতে স্থান পেয়েছে সাতপৃষ্ঠা মহানগরের বর্ণনা-বিবরণে। রতনের বিস্ময় এবং দিশেহারা অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে প্রেমেন্দ্র অক্লান্ত। "মহানগরে"র থেঁতলেযাওয়া কদমফুলের বিবর্ণ রূপের মধ্যে রতনের আর্ত চেহারা আমাদের ব্যস্ত করে। প্রেমেন্দ্রের মনে ছিল কিনা জানি না কিন্তু আমাদের কারও-কারও নিশ্চয়ই মনে পড়বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের হতভাগিনী সুসানের লনডনে আসার অভিজ্ঞতাটি। প্রেমেন্দ্রও মহানগরের ইটকাঠ-যন্ত্রের চাপে পিষ্ট মানুষের কথা বলেছেন। স্নেহমমতা ভালোবাসা কিভাবে দলিত হয়, সেই কাহিনীই প্রেমেন্দ্র বলতে চেয়েছেন। প্রেমেন্দ্রের গল্পে গ্রামে ঢুকে পড়ে শহর। আর তার ফলে যে দ্বন্দ্বসংঘাত ঘনিয়ে ওঠে তার সাক্ষী হয়ে থাকি আমরা। এখানেই এই গল্পটির আবেদন, যা সেকালে-একালে সমান। বস্তুত তেলেনাপোতায় পাঠককে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মাছের মতো সরল জীবনে; সেখানে শহর ঢুকে পড়েছিল গ্রামে আর এখানেও তিনি বলেছেন 'আমার সঙ্গে চলো মহানগরে।' 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' সপ্তপদীর (১৯৫৫) গল্প। ঘনাদার গল্প। এ গল্পের শিল্পকলা অন্যরকম। বিদেশী নামের ঘন-ঘন উচ্চারণে পাঠক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এও এক ধরনের রূপকথা। তবে বড়োদের জন্য। সানমুর নির্জন দ্বীপে দুশো বছর জুড়ে প্রতীক্ষা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে প্রত্নতত্ত্বের ডিটেলে। আর শুরুতেই রবিনসন ক্রুশোর উল্লেখে বিশ্বাসের বীজটি বুনে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র গল্পের মধ্যে।

সংকলনগ্রন্থে ১৯৩০ থেকে ১৯৬৬ (?) পর্যন্ত লেখা গল্পগুচ্ছের কিছু গল্প স্থান পেয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগড়নের ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয় মাত্র বারোটি গল্প পড়ে। কিছু আলোচনা রামরঞ্জন রায় করেছেন তাঁর প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কিত গবেষণা-গ্রন্থে। ভূদেব চৌধুরীর মূল্যবান আলোচনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। এই সংকলনে এমন কিছু গল্প আছে যেগুলিতে প্রেমেন্দ্র ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিছু গল্প আছে যেখানে প্রেমেন্দ্র কেবল দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। কালের প্রবাহে চলমান জীবনের একটি টুকরো তুলে আনেন প্রেমেন্দ্র। তিনি প্রবাহের ঢেউটির উচ্চাবচ রেখা লক্ষ করেন। মাঝে-

মাঝে কিছু তিক্ত মন্তব্য করেন। সৃষ্টির বিধান সম্বন্ধে এই তিক্ততা তাঁর গল্পে মাঝে-মাঝেই দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কথিকায় কিন্তু এই তিক্ততা নেই। আর এই তিক্ততা থেকেই গল্পে এসেছে বক্রতা আর লাঞ্ছনার কঠিন উদ্ভাস। কল্লোলের লেখকবৃন্দের মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল এবং তা থেকে যা উঠে আসতে পারত, অথচ আসেনি, প্রেমেন্দ্রের গল্পে তার ইশারা এবং ইঙ্গিত পাই। সেজন্যেই হিংস্র সাপের, আগুনের আর অন্ধকারের আনাগোনা প্রেমেন্দ্রের গল্পে। এমনকী মাছরাঙা পাখিরও ব্যঙ্গ তাঁর গল্পে ছিটকে পড়ে। কবিতায় যেমন একটা ইমেজকে ঘিরে জ্যোতির বর্ণালি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি প্রেমেন্দ্রও এক-একটি উপমার আশ্রয়ে সে জ্যোতিকে প্রত্যাশিত পথে বিকিরিত করে দেন। নাড়গড়া-নাড়ভাঙা, কদমফুল থেঁতলে-যাওয়া এরকম ইমেজ।

প্রেমেন্দ্র অনেক সময় গল্পের পরিণতিকে আমাদের জানিয়ে দেন আগেভাগেই। বোঝা যায়, গল্পের পরিণতিতে যে বিস্ময় বা চমকজাগানোর প্রয়াস কোনো-কোনো গল্পকারের লেখায় পাই সে পদ্ধতি থেকে তিনি সরে আসতে চান কখন-কখনও। যেমন "হয়তো" গল্পে পোল থেকে ফেলে দেবার ঘটনাটি তিনি আগেই বলে দিয়েছেন। অথবা, পার্কে আত্মহত্যার বিবরণ পুলিশের ডায়েরি থেকে উদ্ধার করে দেন "কুয়াশা" গল্পে। তারপর আত্মহত্যার কার্যকারণ সন্ধান করেন প্রেমেন্দ্র। এতে গল্প কৌতূহল-সৃষ্টির দিক থেকে কিছুটা ফিকে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনুষ্ঠিত ঘটনাটির বিবরণ জানতে আমাদের কৌতূহলকে প্রেমেন্দ্র বাড়িয়ে দেন সূচনাটির নাটকীয়তাকে শীর্ষবিন্দুতে স্থাপন করে। ঝড়োঝাপ্টায় পোল থেকে একজন পুরুষ একজন নারীকে ফেলে দিতে চাইছে—এমন ঘটনার শিহরন আমাদের বিপর্যস্ত করে। সম্বিৎ ফিরে পেলে আমরা জানতে চাই কেন এমন হল। কেন এবং কিভাবে ঘটল এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার—এ দুটি প্রশ্নে আমরা বিব্রত হতে থাকি। এমনকী 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' —এ বাক্যটিও শিক্ষিত পাঠককে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর আমরা জানতে চাই কেন ঘনাদা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

আসলে প্রেমেন্দ্রের গল্পে নাটকীয়তা একটা বড়ো উপাদান (অনেক গল্পকারের রচনা সম্বন্ধে একথা বলা যায়)। ভূপতি যখন ট্যাক্সি ডেকে বিনতিকে ফেলে রওনা দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ বিনতির আবির্ভাবে শান্ত জলে আবর্ত সৃষ্টি হয়। অথবা, ভূপতির বেশির ভাগ আচরণ নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করেছে—একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে। "জনৈক কাপুরুষের কাহিনী" ছোটখাটো মুহূর্তকে বাদ দিয়ে হঠাৎ করুণার স্টেশনে আবির্ভাব এমনি এক চমকপ্রদ ব্যাপার বলে মনে হয়। 'হয়তো' গল্পে মাধুরীর আবির্ভাব প্রেমেন্দ্রের ভাষাতেই বলা যাক। প্রেমেন্দ্র মাধুরী সম্বন্ধে বলেছেন 'মাধুরীর বিবাহ হইয়াছে কি না বলা অসম্ভব। সে চওড়াপাড় শাড়ি পরে, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলংকার সারাক্ষণ ঝলমল করে, পায়ে আলতা পরিয়া বিশ্বফলের মতো অধর দুটি তাম্বুলে রঞ্জিত করিয়া সারাদিন সে পটের ছবিটি সাজিয়া থাকে।' এই নারী প্রথম দিন দেখা দিল এইভাবে: 'সহসা অন্ধকার পথ কাহার সুমধুর কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। ঝি চমকিয়া চুপ করিল। লাবণ্য ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া এই সুমধুর হাস্যের উৎস ঠাওর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।' 'সহসা' 'চমকিয়া' শব্দগুলি নাটকীয়তার ইঙ্গিত। এই গল্পের নায়ক মহিমের লাবণ্যকে ঘরে তালাবন্দী করে রাখা কিংবা স্বপ্নে লাবণ্যের ব্যভিচারিতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা নাটকীয় দৃশ্যের রোমাঞ্চকরতাকে চিনিয়ে দেয়। একরকমের সিনেমাশিল্পের নির্দর্শনও বলতে পারি। "তেলেনাপোতা আবিষ্কারে" যামিনীর শরীর যখন মৃদু উচ্চারণ করে 'বসে আছেন কেন? টান দিন।' তখনও চমক সৃষ্টি হয়। যামিনীর মার করুণ আর্তির জবাবে যখন শুনতে পাই 'না মাসিমা, আর পালাব না' তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমরা

এরকম উত্তরের জন্য প্রস্তুত থাকি না। প্রেমেন্দ্রর গল্পে 'হঠাৎ', 'সহসা', 'অকস্মাৎ', 'চমক', 'চমকিয়া' জাতীয় শব্দ বারেবারে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় ছোটো গল্পে এই শব্দগুলির প্রয়োজন খুব বেশি। ছোটোগল্প উপন্যাস নয়। বিশ্লেষণের বিস্তৃত জায়গা পান না লেখক। অতএব লেখকের পাঠককে অপ্রস্তুত করতে হয়। ঐ শব্দগুলি অনেকটা বাফারের মতো। শব্দ-গুলি স্প্রিং। চলতে-চলতে লাফিয়ে ওঠে, থেমে যেতে হয় সকলকে। গল্পের মোড় তখন অন্যদিকে ঘুরে যায়। ঘুরে গেলেও পশ্চাদ্‌বর্তী চলার রেশের সঙ্গে পরবর্তী চলার যোগসূত্রটি হারিয়ে যায় না। বাফার পূর্বার্ধ এবং অপরার্ধ ধরে থাকে ঠিকই। স্প্রিঙের উপর চাপ পড়লে দুটো দিকই দুলে ওঠে আর কিছু কম্পন শুরু হয়। প্রেমেন্দ্রর গল্পে এই দোলা এবং কম্পন আমরা ঘুরেফিরে পেতে থাকি। এমনকী "স্টোভ" গল্পে যে চাপা, মনস্তত্ত্ব আমাদের উদ্‌-বেজিত করতে থাকে, সেখানেও প্রেমেন্দ্র ঝাঁকুনি দিয়ে-দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান। স্টোভটা বার্স্ট করবে কিনা—এটাই তো চরম উত্তেজনার বিষয়। আর ঝাঁকুনি দেন কিভাবে? স্টোভের শব্দের সূক্ষ্ম ধ্বনিগুলি বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ওই এফেক্ট নিয়ে আসেন। 'স্টোভটা হঠাৎ দপদপ করে ওঠে', 'তবু থেকে-থেকে অদ্ভুত শব্দ করে এমন দপদপ করে ওঠে যে ভয় করে', 'তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকর।' স্টোভের সাইলেনসরটা খারাপ। আর মল্লিকা-শশিভূষণের ভীরু স্মৃতিচারণ একবার দপদপ করে আবার একবার থেমে যায়। আর একটু শোনা যাক। স্টোভটা 'হঠাৎ ফেটে যেতে পারে', 'স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলি বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়,' 'নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে চারিধারে যেন ফণা তোলে', 'স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড', 'স্টোভের আওয়াজটা বড়ো বিশ্রী শোনাচ্ছে না?' 'স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করছে।' গল্পটির নাম "স্টোভ"। অতএব স্টোভের প্রসঙ্গ ঘুরে-ফিরে আসবে জানি। কিন্তু ধ্বনির এই বৈচিত্র্য নরনারীর বিচিত্র সংলাপে ভাবনায় বিস্তৃত হয়ে যায়। আসলে ছোটো গল্পে একটা চীৎকার ("হয়তো"), তালা খোলার মৃদু শব্দ ("কুয়াশা"য়), অথবা দেশলাই জ্বালার শব্দ ("শৃঙ্খল") শেকল খোলার শব্দ অনেক কথা বলে। এইরকম কখনও-কখনও প্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর দৃষ্টি মেলে ধরেন এবং তুলে আনেন বোবাপ্রকৃতির ভাষা। যেমন 'মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়' ("মহানগর") অবশ্যই লিপিকার কথিকার ভাষা, "হয়তো" গল্পে ঝড়ের বর্ণনা, "শৃঙ্খল" গল্পে বিবর্ণ ঘাসের জমি, "পুন্নাম" গল্পে বিশাল আকাশে নক্ষত্রের আলো। এই রকম আছে দিনরাত্রির আলো-অন্ধকারের বিস্তার প্রেমেন্দ্রের গল্পে। এসবই যেন অর্কেস্ট্রার চেহারা নিয়ে নেয়। সব মিলে ঐকতানের সৃষ্টি করেন প্রেমেন্দ্র।

"লেভেল ক্রসিং" গল্পের কালে পৌঁছে প্রেমেন্দ্র কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। সত্যিই প্রেমেন্দ্র একটা ক্রসিং-এ পৌঁছে গেছেন। ক্রসিং-এ এসে তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছেন নিশ্চয়ই। যাদের তিনি চিনতেন তারা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। প্রচুর অভিজ্ঞতায় প্রেমেন্দ্র সাবধান হলেন।

রবীন্দ্রনাথের "নতুন পুতুল" (লিপিকা) কথিকায় নূতন শিল্পীর হাতেগড়া পুতুলের আদর আমরা দেখেছি। আর পুরনো বুড়ো শিল্পীর দীর্ঘনিশ্বাস কথিকাটিকে করে তুলেছিল থমথমে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নাতনির কণ্ঠ থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এল 'দাদা, তোমাকে যুদ্ধ'। আমরা বুঝতে পারি নূতন শিল্পী কিষণলালের যাত্রাপথে বুড়ো 'দাদা'-কেও চাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথকে ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথকে 'যুদ্ধ' সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে তিনি গড়ে তুলতে পারেন "পুতুল ও প্রতিমা"।

এই সংকলনটিতে সুব্রত নিয়োগী একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ভূমিকাটি ‘প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প প্রসঙ্গে’ খুব সুন্দর। কিন্তু তাঁর এই ভূমিকা কোন্ সংকলনের? তিনি লিখেছেন প্রিয় দশটি গল্প পেয়ে তিনি খুশি। সংকলনে আছে বারোটি গল্প! অবশ্য দুটি গল্প তাঁর প্রিয় নাও হতে পারে। তাহলে সে দুটি কোন্ গল্প? ভূমিকাতে তিনি “বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে” গল্পটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। সংকলনে সে গল্পটি নেই।

সম্পাদক পল্লব মিত্রকে ধন্যবাদ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পসংকলনটির পুনর্‌মুদ্রণের (?) জন্য। কিন্তু গল্পগুলির রচনাকাল, কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত—এসব তথ্য খুবই জরুরি। আমরা আশা করব পরবর্তী সংস্করণে অথবা মুদ্রণে এগুলি পাব।*

*প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প। নাভানা, কলকাতা-১২। চল্লিশ টাকা।

এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর

অলোক রায়

বৌদ্ধ জাতকের সংখ্যা অনেক, কোনো এক সময়ে কোনো এক ব্যক্তি সবগুলি জাতকও রচনা করেন নি। অনেকদিন ধরে অনেক কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে জাতক-কাহিনীমালা। অতীত, বর্তমান এবং উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রনির্দেশ—জাতকের কাহিনীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হলেও তার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় গৌতম-বুদ্ধের অতীতজন্মবৃত্তান্ত। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় বোধিসত্ত্ব “পূর্বনিবাসজ্ঞান” লাভ করেছিলেন। অবশ্য আমরা কেউই জাতিস্মর নই, কারণ আমাদের পক্ষে ‘বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহপূর্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন…এবং পরিশেষে পূর্বপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ’ (ঈশানচন্দ্র ঘোষ) হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু “প্রেমাঙ্কুরবেশে” কোটিকল্পকাল না হলেও অর্ধশতাব্দী কালপরিধির মধ্যে মহাস্থবিরের নব-নব জন্ম অসম্ভব নয়। যখন অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকানো যায়, তখন দেখা যায় কত মানুষ আর ঘটনার শোভাযাত্রা। আমরা ব্যক্তি-বিশেষের আত্মজীবনী বা মেময়ার্সের মধ্যে স্মৃতি-রোমন্থনের কত রূপ দেখেছি, ফিরে গেছি অন্যকালে। কিন্তু প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছাড়া আর কেউ জাতক লিখতে পারেন নি, কারণ একজন্মে এত বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা কার ভাগ্যেই বা জোটে! অথবা অভিজ্ঞতার বিস্তারও নয়, এই “প্রান্তরের গান” একমাত্র প্রেমাঙ্কুরের কণ্ঠেই শোনা যেতে পারে, যিনি জীবন-প্রান্তে পৌঁছে বুঝি লাভ করেছিলেন পূর্বপ্রজ্ঞা। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন,

> সম্মুখ দিয়ে বয়ে গেছে জগৎসংসার। তার তীরে বসে তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কেঁদেছি, কিন্তু সে-তৃষ্ণা মেটাবার পানীয় বাইরে থেকে কোনোদিনই যে পাওয়া যায় না, এ কথাও মর্মে-মর্মে অনুভব করেছি। এমন সংশয়ও এসেছে—এই যে অসংখ্য নরনারীর জনতা আজ সামনে দিয়ে চলে গেছে, তাদের সঙ্গে সংযোগের সূত্রটি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল

কি না! কোন্ যন্ত্রী অলক্ষ্যে বসে আমাদের নিয়ে যোগ-বিয়োগের আঁক কষছেন কিন্তু ফল-নির্ণয়ে এখনো পৌঁছতে পারেন নি। জীবন তো সেই চক্রীর হাতের কোনো সুপরিকল্পিত কাহিনী নয় যে, ল্যাজ-মাথা এক দড়িতে বেঁধে ড্যাডাং-ড্যাং ড্যাডাং-ড্যাং করে দেহটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে। আজ মোহের কাজল চোখ থেকে অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে, তাই তো কোনো তত্ত্বের জ্ঞানশলাকায় এই নেত্রতারকা বিদ্ধ হতে দিই নি। সেই খোলা-চোখে মানুষ দেখার ইতিহাস এই জাতকে আমি বার-বার জন্মেছি—বারবার মরেছি। আমার সেই অসংখ্য জন্ম মরণের কথাই পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে আজ বিদায় নিলুম।

"মহাস্থবির জাতক" (১৩৫১, ১৩৫৪) এদিক থেকে বাঙলা সাহিত্যে এক পরম বিস্ময়। প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার আকর্ষণ একটুও কমে নি। সম্ভবত আরও দীর্ঘকাল প্রেমাঙ্কুর বেঁচে থাকবেন এই একটি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে, বা এই একটি গ্রন্থের জন্য। প্রেমাঙ্কুরের লেখা অধিকাংশ উপন্যাসের সঙ্গে আধুনিক পাঠকের কোনো পরিচয় নেই (সেগুলি সংগ্রহ করা যে কত কঠিন, এই প্রবন্ধ লেখার সময় তা জানা গেল), এবং সত্য কথা বলতে কী, সেগুলি সঙ্গে পরিচয় না ঘটাই এক হিসাবে ভালো। কেন সে কথা পরে বলা যাবে। আর "মহাস্থবিরের গল্প-সমগ্র" বইটি (যে-কোনো কারণেই হোক, প্রেমাঙ্কুরের লেখা সব গল্প এই সংকলনে স্থান পায় নি) সহজ-প্রাপ্য হলেও তার একটা বড়ো অংশ কাল-চিহ্নিত, আর সেইজন্যই হয়তো সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

যে-লেখকের জন্মশতবর্ষ পালন করছি আমরা, তিনি যে অন্য এক যুগের লেখক, সেকথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব তথা জন্ম ঠিক কবে হয়েছিল, সুনিশ্চিতভাবে তা বলা মুশকিল। "গল্প লেখার গল্প" (১৪ এপ্রিল, ১৯৪৫) বলতে গিয়ে প্রেমাঙ্কুর পরিহাস-ছলে বালকবয়সে কবিতা রচনার প্রয়াস বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যাবেলা নন্দনপাহাড়ের বাঘ, শিকারে না বেরিয়ে গুহায় প্রবেশ করেছে—'নন্দন পর্বত গুহে ব্যাঘ্র প্রবেশিল।' এর পরেও তিনি কবিতা লিখেছেন সত্য, কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর পুত্র মণিবাবুর পরামর্শে যেদিন গল্প লেখার কথা ভাবলেন, সেদিন প্লটের অভাবে তিনি নাকি বিপন্ন বোধ করেছিলেন! "গল্প লেখার গল্প" (১৩৫৩) বইয়ের সম্পাদক লেখক-পরিচয় দানের সময় জানান, প্রেমাঙ্কুরের প্রথম লেখা "নিশির ডাক"। কিন্তু "বাজীকর" (১৩২৮) গল্প-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "নিশির ডাক" গল্পটি "ভারতী" পত্রিকায় ১৩২৬ সালের পৌষ মাসে মুদ্রিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেখানে তাঁর আরও অনেক গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৩১৪ সালে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে প্রকাশিত "ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র" যদি "ভারতী" পত্রিকার সঙ্গে তার প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে থাকে, তাহলে তারপর ষোলো-সতেরো বছর সেখানে তিনি নিয়মিত লিখেছেন। (প্রভাত-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "জাহ্নবী" পত্রিকায় প্রেমাঙ্কুরের প্রথম ছোটো গল্প প্রকাশিত হয়)। এদিক থেকে প্রেমাঙ্কুরকে "ভারতীর লেখক" বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা "ভারতী"র প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭ সালে। প্রথমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯১৪ সালের পর স্বর্ণকুমারী দেবী পত্রিকা প্রকাশের কাজে আর সময় দিতে না পারার ফলে ঠাকুরবাড়ির জামাতা তরুণ লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) সম্পাদকের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) স্বর্ণকুমারীকে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন, মণিলালের আমলে তিনি হলেন যুগ্ম-সম্পাদক। মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহন যে ন বছর

(১৯১৫-২৩) "ভারতী" পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেই সময়টিকে সাধারণত "ভারতী-যুগ" বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বে "ভারতীর বৈঠকে" বা "মণিলালের আসরে" যাঁরা যোগ দিতেন, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, অমল হোম—সকলেই ছিলেন প্রেমাঙ্কুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হেমেন্দ্রকুমার পরবর্তী কালে প্রেমাঙ্কুর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে তাঁর হাতযশ। পরিচিত হন তিনি ভারতী গোষ্ঠী-ভুক্ত অন্যতম বিখ্যাত লেখকরূপে।'

সময়টা রবীন্দ্রযুগ। ভারতীগোষ্ঠীর লেখকেরাও ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। কিন্তু ছোটোগল্পে বা উপন্যাসে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করেন নি। হয়তো ভাষা-রীতির ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব থাকতে পারে, যেমন প্রেমাঙ্কুরের "দুই রাত্রি" (১৩৩৪) উপন্যাসে চরিত্রের উপস্থাপনে—'অলকের পিতামহ ভুবন ভাদুড়ী মস্ত লোক ছিলেন। তাঁর শত্রু ছিল অনেক, অনুগত এবং শরণাপন্নও ছিল অনেক, কিন্তু মিত্র ছিল না একজনও। ...ইংরেজি লেখাপড়া না জানলেও বিদ্বান ছিলেন এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ভুবন ছিলেন ঘোরতর মায়াবাদী। কিন্তু মায়াবাদী হলেও তিনি নিজের অস্তিত্বটা সংশয়ের বুকে এমন-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে অন্যচেরারা তাঁর উপদেশে বিশ্বের সমস্ত জিনিসকে মায়া বলে মানলেও তিনি যে বাস্তবের একটা জলন্ত নিদর্শন এ কথাটা তারা কিছুতেই ভুলতে পারত না।' কিংবা, "কল্পনা দেবী" (১৩৩৮) উপন্যাসে অনুরূপ বর্ণনায়—'দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন জন্মেছিলেন এ-যুগে বটে কিন্তু তাঁর মনটা বাঁধা ছিল সে-যুগের খোঁটায়। আধুনিক আবহাওয়ার ঝড়-ঝাপটা যতবার তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে ততবারই তিনি দ্বিগুণ বেগে সে যুগের খোঁটার মূলে ফিরে এসেছেন।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বা ছোটোগল্পে যেভাবে বিশেষ অভিজ্ঞতা নির্বিশেষত্ব লাভ করে, প্রেমাঙ্কুরের রচনায় তা প্রত্যাশিত নয়। প্রেমাঙ্কুরের কবিমনের পরিচয় তাঁর সব গল্প-আখ্যানেই পাওয়া যায়, কিন্তু কবিত্ব যেন অধিকাংশ সময়ে কিছুটা আরোপিত। "গল্প লেখার গল্প" বলার সময়ে তিনি পরিহাসের ভঙ্গি গ্রহণ করলেও, সেখানকার মূল কথাটি হয়তো তাঁর সব রচনা সম্বন্ধেই কমবেশি পরিমাণে প্রযোজ্য—'শরতের মাঝামাঝি ধানক্ষেতের সে শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে—শহরের যেখানেই দাঁড়ানো যায়, দূরে কাছে সব উঁচু নীচু পাহাড় দেখা যায়। চারদিকেই অপর্যাপ্ত কবি-মনের খোরাক ছড়িয়ে। আমি যদি সত্যিকারের কবি হতুম তাহলে কবি করুণানিধানের মতন দেওঘরের উপর একটা অমর কবিতাও লিখে ফেলতে পারতুম। অর্থাৎ প্রথম দেওঘরে গিয়ে ভাবটা খুব জোরই লেগেছিল কিন্তু হায় কাব্যের ভাষা যোগাল না।' এ তো শুধু 'বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে' অপরিণত-বয়স্ক লেখকের প্রকাশক্ষমতার অভাব নয়, আসলে বর্ণনীয় বিষয়কে বিশেষ "রূপসজ্জা" দেওয়ার মানসিকতার অভাব। প্রেমাঙ্কুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাঁধাধরা পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি, কিন্তু সে কালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে প্রাচীন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ভালোমতো পরিচিত হয়েছিলেন। "ভারতী"র লেখকদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগই ছিল—'তর্জমা করি হইবি মোপাসাঁ/ চুরিটি করিয়া মন্দ।' কিন্তু তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের মতো অনুবাদকর্মে আগ্রহ বোধ করেন নি প্রেমাঙ্কুর। রোমানটিক কবিতা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল, এদিক থেকে শুধু মহাস্থবির নয়, তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের নায়কই রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারে 'এ গলিতে বাস মোর তবু আমি জন্ম রোমানটিক।' তার মানে অবশ্য কবিত্ব করার জন্য কবিত্ব করা নয়। জাতকের একটি কাহিনীর সূচনা মনে পড়বে—'আজ আশ্বিনের বুকে আষাঢ়ের নব ঘন ফুঁ পিয়ে ফুঁ পিয়ে কেঁদে উঠছে। ছাতের ঘরে জানলার ধারে বসে আছি, সামনে আমার

জাতকের খাতা খোলা। খেয়ালি প্রকৃতির দাপাদাপি চলেছে আমাকে ঘিরে—আমার মনকে ঘিরে। আমার উদাসীন মন ফিরে চলেছে স্মৃতির সরণী বেয়ে সুদূর অতীতে। গাঢ় বিস্মৃতির যবনিকা ভেদ করে চলে গেছি একেবারে অতীতের অন্তস্তলে, সেখানে আমার মানসরচিত রাজ্য পড়ে আছে সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে। সেখানে কত বিরাট প্রাসাদ, জ্যোতির্ময় হর্ম্য, বজ্রমণির দেওয়াল, মরকতের ছাত। উপবনে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল মূর্ছিত হয়ে নুয়ে পড়েছে মাটির দিকে। ঘরে-ঘরে কত নর-নারী—বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—আমার নর্মসহচর, আমার আত্মার সহধর্মিণী তারা, সকলেই ঘোরতর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন।' এখানে 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে' বা 'দাপাদাপি' শব্দগুলির পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার অসম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের কানে শব্দগুলি আপত্তিকর ঠেকে নি স্পষ্টই বোঝা যায়, রাবীন্দ্রিক উপমা বা বর্ণনাভঙ্গির পরিবর্তে "ভারতী"র তরুণ লেখকেরা অন্য পথের সন্ধান করেছেন। সব সময় তাঁরা সফল হয়েছেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের চেষ্টাটুকু লক্ষণীয়। পাঁচ ছ বছরের বালক স্থবির গড়ের মাঠে সূর্যোদয় দেখছে—'মাঠের মধ্যে তখনও ঘন কুয়াশা। দূরে গাছপালা, লাটের বাড়ি কিংবা জাহাজের মাস্তুল কিছুই দেখা যায় না। পূর্ব-দিকে সূর্য উঠেছে, কিন্তু তার যেন কোন তেজই নেই। সূর্যকিরণ সেই ঘন কুয়াশার ওপর পড়েছে বটে, কিন্তু তা ভেদ করতে পারছে না; জলের ওপরে তেলের ফোঁটাগুলো যেমন করে ভাসতে থাকে, তেমনই ধোঁয়াটে কুয়াশার মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খানিকটা করে আলো ভাসছে মাত্র।' একে কি অ্যানটি-ক্লাইম্যাক্স বলব? জলের উপর তেল ভাসার সঙ্গে কুয়াশার উপর আলো ভাসার তুলনা অভিনব সন্দেহ নেই, আর এই অভিনবত্ব (হয়তো একেবারে অভিনবও নয়, "ভারতী"র অন্যান্য লেখকের রচনাতেও একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে) প্রেমাঙ্কুরের

প্রায় সব রচনাতেই দেখা যাবে।

অবশ্য রোমানটিকের পক্ষে বাস্তববাদী হতে বাধা নেই। প্রেমাঙ্কুরের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে অন্যতম ভাবপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে তীব্র সহানুভূতি-বোধ,—দুঃখী দুর্গত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা এবং কখনো দুঃখ দূরীকরণের প্রয়াস। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এইখানে সাদৃশ্য। জাতকের মধ্যে একাধিকবার শোনা যাবে এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ—'মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলুম—এদের অবস্থা, এদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকর্তা আমায় এদের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এদের নগ্ন অঙ্গে বস্ত্র দিতে হবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে এদের বুকে। এই সব কথা চিন্তা করতে করতে-আনন্দে আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করতে লাগল।' (মনে পড়বে, প্রেমাঙ্কুর একদা গোর্কির লেখা "লোয়ার ডেপথ্‌স" অবলম্বনে লিখেছেন বাঙলা নাটক "মাটির ঘর", যা বাঙলা দেশে গোর্কিচর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা)। জাতকের অন্তিম অংশে আবার সেই একই প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে, অবশ্য কিছুটা নতুন তাৎপর্য নিয়ে—'মনে পড়ল সেই কৈশোরের প্রতিজ্ঞা—এদের অবস্থা—এদের দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। এদের নগ্ন অঙ্গে বস্ত্র দিতে হবে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে এদের বুকে। কিন্তু কোথায়—মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেল তাদের অস্তিত্ব!···আজ সর্বসমক্ষে এই কথা বলে যেতে পারি যে, প্রান্তরের গান আমার এই জাতকে আমি কোনো কৃত্রিম ঘরবাড়ি বসাই নি। মানুষকে দেখেছি কিন্তু তাকে সাজাই নি। তার বিষ ও তার অমৃত দুই-ই দু হাতে ভরে নিয়ে সর্বাঙ্গে লেপেছি। কোনো ছেঁদো-কথার জাল ফেলে উড়ন্ত-পাখির ডানা বাঁধতে চাই নি।' হয়তো কৈশোরে কখনও বিমূর্ত সৌন্দর্য-ভাবনা 'পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে'

সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে চেয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মপরিবারের সন্তান হয়েও ব্রহ্মোপাসনার, এমনকী রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধানে তৎপরতার যেন কিছুটা অভাব দেখা গেছে প্রেমাঙ্কুরের মধ্যে। বালক বয়সে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে শিবনাথ শাস্ত্রীর উপাসনা শুনে মনে হয়েছে, 'কে সে নিষ্ঠুর, কোথায় তার বাড়ি, কেমন ভীষণ তার চেহারা, কত শক্তি সে ধরে যাকে এমনভাবে অনুনয় করা হচ্ছে, অতি বড় পাষাণও যাতে দ্রবীভূত হয়। স্থবির স্থির করলে, বড় হয়ে এই জনকে খুঁজে বার করতেই হবে। আজও স্থবির তারই অনুসন্ধানে ফিরছে।' জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও হয়তো এই অনুসন্ধানের শেষ হয় নি, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে প্রাপ্তি কিছু ঘটলেও জাতকের শেষ খণ্ডে তাঁর মুখে শোনা যায়—'আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও ও-পারের রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হলো না—ও-পারের ডাকের চিঠি এসে পৌঁছল, কিন্তু চিঠির হরফ অজ্ঞাত রয়ে গেল। মানুষের অহমিকা তার কল্পনার আলোকপাতে সে-রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করে—ফলে মণিরত্নের বদলে পায় ভাঙা শুক্তি-শামুক—পঞ্চভূতগত বা ভূতগত।' ভাঙা শুক্তি-শামুক আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চয় মূল্যহীন, কিন্তু সাহিত্য তো গড়ে ওঠে তাই নিয়েই, বিশেষত কথাসাহিত্য।

অল্প বয়সে লেখা উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা ভাবালুতা থাকতে পারে। অভিজ্ঞতানির্ভর কাহিনীও তখন বক্তব্য প্রতিপাদনের উপায় হিসাবে আকস্মিকতা তথা চমৎকারিত্বপূর্ণ ঘটনাকে প্রশ্রয় দেয়। "ঝড়ের পাখী" (১৩২৪) উপন্যাসে শুধু লীলার জন্মরহস্যে নয়, অসংখ্য ব্যক্তির সমাবেশে (জগদীশ-গিরিবালা, ভুবন-অবিনাশ-সুবোধ, যোগেশ-বিরাজ, ঈশান, অনুপম) এবং মৃত্যুর ঘনঘটায় কাহিনী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। গ্রন্থের সূচনায় ভূমিকার মতো কয়েক লাইনে যে প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যেও বিশেষ কোনো অভিনবত্ব নেই—'বিবর্তনে মানুষের হাত, পা, আকৃতিরই শুধু পরিবর্তন হয়েছে। পশুদের খোলস তার অঙ্গ থেকে ঝরে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার আসল জায়গাটা পশুই থেকে গিয়েছে। তাই অমানুষরা আসল মানুষদের মহামানুষ বলে কল্পনা করে।' সব চরিত্রকেই স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—অমানুষ আর মহামানুষ। "দুই রাত্রি" উপন্যাসে জমিদারপুত্র অলকেন্দ্রের পতিতা-কন্যা রাণীকে বিবাহ, কিংবা "অচল পথের যাত্রী" উপন্যাসে জমিদারপুত্র যোগীনের পতিতা নারী নলিনীকে আশ্রয়দান ও তাকে ভালোবাসা—সব-কিছুর পিছনে হয়তো ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের সুঘোষিত সেই নীতিটি কাজ করেছিল—'সমসাময়িক সমাজের গ্লানির প্রতি, বিশেষ করিয়া পতিতা নারীর প্রতি অবিচারের' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু এর জন্য হত্যা, কারাবাস, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, একাধিক মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা একান্ত অনিবার্য ছিল না। "অচল পথের যাত্রী" প্রেমাঙ্কুরের খুব প্রিয় উপন্যাস ছিল (ডেভিড কপারফিল্ড সম্বন্ধে ডিকেন্সের স্বীকারোক্তি মনে পড়বে—'Of all my books, I like this the best'), এমনকী "মহাস্থবির জাতকে"র থেকেও এই উপন্যাসটিকে তিনি না কি সার্থকতর সৃষ্টি বিবেচনা করতেন। কিন্তু যোগীনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে নি, তাই স্বদেশী যুগের উল্লেখ ছাড়া কাহিনীকে মনে হয় এক স্বপ্নলোকের সামগ্রী—'কৈশোর ও যৌবনে কত আশা ছিল। জন্মভূমির সেবা করব, আর্তের সেবা করব। স্বপ্ন দেখতুম, কংগ্রেসে কন্‌ফারেন্সে আমার মুখের একটা কথা শোনবার জন্য দেশের লোক উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এই মুমূর্ষু জাতি আমার বক্তৃতায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। দেশের সবাই আমাকে আদর্শ মনে করছে, সকলে মুক্তকণ্ঠে আমার জয়গান করছে—কুল পবিত্র হল, জননী কৃতার্থা হয়েছেন। সেই আমি কি হয়েছি? আমার জন্য পিতা দেশত্যাগী হয়ে বিদেশে প্রাণত্যাগ করেছেন, দেশের লোক আমার নামে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে

নেয়। বন্ধুবান্ধব কেউ আমার নামও করে না। আমি তো সবই হতে পারতুম, তবু কেন আমার এ দুর্দশা হল?" জাতকের মধ্যেও অনুরূপ আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে, কিন্তু জাতকে কাহিনী দেশকালের সঙ্গে এমনই সম্পৃক্ত, এবং চরিত্রগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, সেখানে আত্মজিজ্ঞাসা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলে গেছে। প্রেমাঙ্কুরের উপন্যাসে দেশকালকে ধরার চেষ্টা আছে, কিন্তু কাহিনী শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে শিকড় বিস্তার করতে পারে নি।

বিশ শতকের সূচনায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামান্য আগে-পরে, অর্থাৎ লেখকের চেনা পটভূমিতেই প্রেমাঙ্কুরের অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনী স্থাপিত। "দুই রাত্রি" উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সমস্যার সঙ্গে স্থান-কালের যোগ খুব স্পষ্ট নয়, তবু লেখক সচেতন-ভাবেই এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন যার মধ্য দিয়ে কাহিনী যেন সাল-তারিখের স্পর্শ পায়। —'স্বদেশী আন্দোলন কিছুকাল আগের ব্যাপার। বিড়ি জিনিসটি তখনো জাতে ওঠে নি। বাঙালী ও ফিরিঙ্গিদের মুখে উড়ছে সিগারেট আর মুসলমানের মুখে বিড়ি।' 'কিছুদিন আগেকার কথা। মোহন-বাগান ক্লাব তখনো শীল্ড পায় নি। মেডিকেল কলেজের ছেলেদের হারাতেই তখন প্রাণ বেরিয়ে যেত।' পনেরো বছর সিভিল সার্ভিসের চাকরির পর নায়ক অলকেশ্রকে 'মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ চাকরির নোঙর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে রাজনৈতিক আন্দোলনের নজ্‌গজে মঞ্চের ওপরে তুলে দিয়ে গেল।' "ঝড়ের পাখী" উপন্যাসেও স্বদেশী আন্দোলন ও প্রথম মহাযুদ্ধের উল্লেখ আছে। অরুণ বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল—'ইউরোপের মহা-সমর আরম্ভ হওয়ায় বিলেত-প্রবাসী বাঙালী ছাত্ররা মিলে একটা দল গঠন করে ইংরেজ সেনাদলে প্রবেশ করেছিল। অরুণ পাশ করে এই দলে যোগ দিয়েছিল।' "কল্পনা দেবী" উপন্যাসে 'সুধাংশুদের আপিস ছিল অষ্টিয়ান সওদাগরদের। যুদ্ধ বাধতেই তাদের আপিস গেল উঠে, সঙ্গে-সঙ্গে মোটা মাইনের চাকর সুধাংশু হয়ে গেল একদম বেকার। হঠাৎ চাকরি যাওয়ায় সুধাংশু একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তার এতদিনকার হিসাব সব গরমিল হয়ে গেল। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে-সঙ্গেই অনেক সওদাগরী আপিস উঠে গেল। কলকাতার আপিস-পাড়ায় হাহাকার রব উঠলো—কোথায় চাকরি—চাকরি কোথায়!' কিন্তু এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে নায়ক অজরের যেমন কোনো যোগ নেই (অজরের চাকরি যায় মেয়েদের কলেজে বিবাহিত না হওয়ার অপরাধে), তেমনি নায়িকা শোভনার কল্পনা-দেবীতে রূপান্তরেরও কোনো সম্পর্ক নেই। প্রেমাঙ্কুরের ছোটোগল্পেও অনুরূপভাবে স্বদেশীযুগের কিছু ছবি আছে ("মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন স্বদেশী যুগের নেতা"—বড়দা), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ ("হিন্দু-মুসলমান ফ্যাক্ট") কিংবা নিতান্ত আধুনিক কালে কালোবাজারীর ব্যঙ্গচিত্র ("ব্যাকে বন্ধল")। হয়তো "মহাস্থবির জাতকে" স্থানকালপাত্রের ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। স্থবিরের প্রথম অভিজ্ঞতাটি একেবারে তারিখ-চিহ্নিত—৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬। তারপর ঘোড়ায়-টানা ট্রাম, গ্যাসের আলো, টালার দাঙ্গা, কলকাতায় ভূমিকম্প, আর প্লেগ মহামারীর সময়ে মেছোবাজারে প্লেগের হাসপাতাল, ভারত মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজসংস্কারমূলক কাজ থেকে শুরু করে রুশ-জাপানের যুদ্ধ, স্বদেশী আন্দোলনের কিছু আগে টহলরাম গঙ্গারামের বক্তৃতা, কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন, এবং স্বদেশী-প্লাবনের কাল পর্যন্ত ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ধরা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টির সন্ধান করে লাভ নেই। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের দৃষ্টি দিয়েই প্রেমাঙ্কুর সব—কিছু দেখেছেন। সেখানে স্বাদেশিকতার উন্মাদনা আছে, সাম্প্রদায়িকতার আচ্ছন্নতা আছে, বাস্তববুদ্ধিপ্রণোদিত বিশ্বনিন্দাবাদ আছে। দৃষ্টান্ত

হিসাবে একটি অংশ উদ্ধৃত করতে পারি—'স্বদেশীর বন্যায় সারা বাংলাদেশ তখন টলমল করছে। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়েছে—গোলামখানা। এই স্বদেশীর কল্যাণে অনেক ছেলে ইস্কুল-কলেজের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, অনেক ধনী-অভিভাবক ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বাইয়ের খলিফারা এই সুযোগে গরীব বাঙালীর পয়সায় বড়লোক হতে লাগল। বাঙালীরা মিলের ধুতি বর্জন করে ডবল দাম দিয়ে বোম্বাই মিলের চট কিনতে লাগল। আর তার পরিবর্তে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা বাংলা ও বিহারের কয়লা বর্জন করে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা আমদানি করে বাংলার ঋণ পরিশোধ করতে লাগল।

'স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ আজ চলচ্চিত্রের মতন মনের পর্দায় একে-একে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে বাঙালীর সেই উন্মাদনার চিত্র, সেই ভাবের জোয়ার—যাতে একদিন তারা হাত-পা ছেড়ে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। অদ্ভুত এই বাঙালী-চরিত্র! তারা পুজো করে শক্তির, কিন্তু চর্চা করে মাধুর্যরসের—তাই কাটলেট ও মালপোয়ায় তাদের সমান রুচি। এই স্বদেশীর দিনে তারা কীর্তনের সুরে যুদ্ধের গান গেয়ে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করে বেড়াতে লাগল।

'...মুসলমানদের গ্রন্থাদি যাই বলুক না কেন, তাঁরা কখনও কোনও সময়েই অন্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে একত্রে বাস করছেন—এমন নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই ইংরেজদের এই চাল-কে তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে বরণ করেছিলেন।

'...কিন্তু ওই Thou, যিনি পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে সবচেয়ে বেশি দুর্জ্ঞেয়—সে কথাটা মানুষ যে জানে না তা নয়, কিন্তু দুর্দিনে পড়ে মানুষ তাঁর কাছে সোনার পাথর-বাটি চেয়ে বসে। হাত পাতলেই যদি তাঁর কাছ থেকে এ জিনিস পাওয়া যেত, তাহলে ঘরে-ঘরেই বিরোধের অন্ত থাকত না। এ কথা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে এই Thou আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সচেতন, এবং বোধহয় সেই জন্যেই হিন্দু-মুসলমানে আজও মিলন হয় নি—মিলন-মন্দির তো দূরের কথা।'

অবশ্য অনেক দূর থেকে অতীতের ঘটনাবলীকে দেখলে তার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন বা তথ্যবিকৃতি ঘটতেই পারে। শৈশবে প্রেমাঙ্কুর কিছুদিন ডাফ কলেজের স্কুল-বিভাগে পড়েছেন। সেখানে পাদরি অধ্যাপক আলেকজানডার টমরিকে তাঁর মনে হয়েছে হৃদয়হীন পাষণ্ড। অথচ টমরির অসংখ্য ছাত্র তাঁদের শিক্ষকের সহৃদয়তা-মানবিকতার কথা জানিয়েছেন। মনে হয় টমরির বর্ণনায় প্রেমাঙ্কুরের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে, আর তা না হলে ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশের স্মৃতি চরিত্রচিত্রণে তাকে বাস্তবভ্রষ্ট করেছে (এই ধরনের ভাষা ব্যবহারের পিছনে যে তিক্ততা লুকিয়ে আছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়—লোকটা জাত্যংশে বোধহয় ইহুদী ছিলেন, কিন্তু বিলিতি। বেঁটেসেঁটে দেখতে, দু-গালে গালপাট্টা)। অথচ ডিকেন্সের মতো প্রেমাঙ্কুরের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই অনেক পরিমাণে আত্মজৈবনিক। ডিকেন্সের মতোই প্রেমাঙ্কুরও জাতকের শেষে বলতে পারতেন 'I seem to be sending some part of myself into the Shadowy World.' বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জীবন অগ্রসর হয়েছে, নানা বাধা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে গড়ে উঠেছে যে জীবনদৃষ্টি, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব আর বঞ্চিত পরাজিত মানুষের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত মমত্ববোধ যার ভিত্তি—তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে দুজনের সাহিত্যসৃষ্টি। ভালো-মন্দের বিচার নয়, উপাদানগত ও প্রেরণাগত ভাবসাদৃশ্যের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। প্রেমাঙ্কুরের গল্পসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি রচনাই "স্কেচেজ" নামে অভিহিত হতে পারে—যেমন, বাতায়নে, ছাতে, রাতে, মুশকিল

আসান, পথে, মাতাল, মণিবাবু, চৌধুরী মশায়, নেলো। তবে এ সবই যেন একমেটে রচনা, জাতকে এইসব স্মৃতিচিত্রই কখনো নির্বাহী কল্পনা ও বহুবিচিত্র বর্ণসম্পাতে পূর্ণাঙ্গ ছোটোগল্পের রূপ লাভ করেছে। তবে জাতকও ডিকেন্সের অধিকাংশ রচনার মতো **'Excellent in sketches, but weak in composition'**। লেখকের নিজের ভ্রাম্যমাণ জীবন ও সংগীতচর্চা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কখনো গল্পের পটভূমি বা নাট্যমুহূর্ত রচনা করে, যেমন, বাজীকর (পুরনো দিল্লির ভগ্নস্তূপের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের সাক্ষাৎ), পথে-বিপথে (নাসিকে কুম্ভস্নান), একবার (লাহোর), ক্ষণিকের অতিথি (উদয়পুর), হিন্দু-মুসলমান ফ্যাক্ট (বিখ্যাত বাজিয়ে ফুফা মিয়া), দিগ্বিজয়ী (দিল্লির সর্বশ্রেষ্ঠ বাজিয়ে সের খাঁ), মরু-মরীচিকা (সংগীতজ্ঞ খাঁ সাহেব)। নিছক গল্প বলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি লেখা হয় নি। কিন্তু উপন্যাস লেখার সময় মনে হয় প্রথম থেকেই লেখক সামাজিক অসংগতি ও অনাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন গভীরতর কোনো সমাজচেতনায় চালিত হয়ে। জাতকে আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই বাস্তবতাবোধে উত্তরণের একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়—'সংসারের চেহারা আমার চোখে দিনদিনই অন্য রূপ ধারণ করছিল। যে-নেশার ঘোরে আমি সংসারকে দেখতুম, ক্রমেই সেই নেশা কেটে যাচ্ছিল। আগে আমি এই দুনিয়াকে নিজের মনের মতন করে দেখতুম—সেটা ছিল আমার মনে পৃথিবীর ভাবমূর্তি। নেশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নগ্ন চেহারা আমার চোখে ফুটে উঠত। বেশ বুঝতে পারছিলুম অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা রূপকথাতেই থাকে, সংসারের কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। কোনো বড় ব্যবসাদারের চোখে পড়ে গিয়ে তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে ভবিষ্যতে সেই ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠা—ওই আত্মজীবনীতেই পাওয়া যায়। বাস্তবে দেখতে লাগলুম—দেবার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যেই প্রবল যাদের দেবার কিছু নেই। আর যাদের দেবার যথেষ্ট আছে নেবার প্রবৃত্তিই তাদের মধ্যে প্রবল। সংসারের রাজকন্যা ও রাজত্ব তো দূরের কথা, একমুঠি ভিক্ষান্নও পাওয়া মুশকিল।' হৃদয়বান মানুষের সাক্ষ্যে মহাস্থবির কখনো পান নি তা নয়, কিন্তু "অমানুষ" এত দেখেছেন জীবনে যে একধরনের সিনিসিজম তাঁর উপন্যাসে প্রথম থেকেই দেখা গেছে। নিজে ব্রাহ্মপরিবারে লালিত হয়েও ব্রাহ্মদের দলাদলি, উপাসনা তথা অনুশোচনার ঘটার মধ্যে কপটতা নিয়ে প্রথম উপন্যাস "ঝড়ের পাখী" লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাস "চাষার মেয়ে" নামকরণেই তরুণ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে—'আমি চাষার মেয়ে, আমার বাবা চাষ করত, আমরা জাতে চাষী-কৈবর্ত।' তারপর মহাজন ও জমিদারের চক্রান্তে চাষীর 'চাষ-বাস করা' উঠে গেল, শহরের আদালতে বারো টাকা মাইনের চাকরি নিতে হয়েছে চাষার মেয়ের স্বামীকে। সুস্থ স্বাভাবিক আদর্শবান যুবাও আদালতের প্রথা মেনে 'উপরি' নিয়েছে, আর সেই ঘুষ নেওয়ার অপরাধে তার কারাবাস হয়েছে। উপন্যাস হিসাবে "ঝড়ের পাখী" বা "চাষার মেয়ে" দুর্বল রচনা, কিন্তু চিরন্তন ত্রিভুজ-প্রেমেটিকাহিনী বাস্তবসমাজপটভূমিতে স্থাপিত হওয়ার ফলেই সে কালের উপন্যাসধারায় এ-গুলি উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয়। প্রেমাঙ্কুরের উপন্যাসে সুখ ও দুঃখ নিয়ে যে প্রশ্ন বারবার উঠেছে, তা কিন্তু পরিপার্শ্ব নিরপেক্ষ নয়, "দুই রাত্রি" উপন্যাসে লেখকের মন্তব্য—'মানুষের সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্তর্ভূতর চতুর্দিকে এমন একটা আবেষ্টন তৈরি হয় যা ভেদ করে অন্য অবস্থা সে অনুভব করতে পারে না। এই অদৃশ্য আবেষ্টন যার যত স্থূল, সংসারে সেই তত সুখী। ...কিন্তু প্রকৃতির এই অমোঘ আবেষ্টন থেকে যে মুক্ত—ধনী অথবা নির্ধন সে যেই হোক—তার জীবনে সুখ কোথায়?'

একদা যাকে সামাজিক উপন্যাস বলা হত (রমেশচন্দ্রের "সংসার"-"সমাজ" থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের "অরক্ষণীয়"-"পণ্ডিতমশাই") প্রেমাঙ্কুর

সেরকম উপন্যাস লেখেন নি। এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রযুগের ঔপন্যাসিক। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ নয়, নিজেরই অন্তরে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার বিরোধ,—আর শেষ পর্যন্ত উত্তরণ, যদি আদৌ উত্তরণ সম্ভব হয়। অবশ্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসা প্রেমাঙ্কুরের স্বক্ষেত্র নয়। মাঝে-মাঝে জীবনরহস্য আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গেলেও সাধারণভাবে তিনি জীবন-পথের পর্যটকমাত্র। 'সুখ-দুঃখের নাগরদোলায়' ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে যে জীবন অগ্রসর হয়েছে, তার পথে-পথে বিচিত্র নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—'কত লোককে ভাই বললুম, কত শয়তানকে আলিঙ্গন করলুম ভাই বলে, কত মহৎকে পদাঘাত করলুম শত্রু বলে। এমনি করে মানবজীবনের তৃতীয়াংশ ক্ষয় করে আজ জীবন-তরণী চড়ায় আটকে গেল।' আলবামের মতো জাতকের পাতায়-পাতায় ধরা আছে অসংখ্য ছবি—কোনোটি গভীর রেখায় জীবন্ত, কোনোটি বর্ণোজ্জ্বল, আবার কোনোটি বিবর্ণ-হয়ে-আসা ছায়া-ভাস মাত্র। রাজকুমারী, ছোটেসাহেব ও দিদিমণি, নবাব সাহেব ও পিয়ারা সাহেব রাম সিং ও সুরযবাঈ, সদানন্দ মহারাজ, পণ্ডিতজী-শংকর-দেবী, দেওকীনন্দন ও সুভগা, ব্রিজশরণ, লছমী মায়ী—এদের কাহিনী-বর্ণনায় কোথাও বক্তব্য প্রাধান্য পায় নি তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভাবাবেগই প্রধান। হয়তো সেখানে শরৎচন্দ্রের দূরাগত প্রভাব লক্ষ করা যাবে—'বহুরূপিণী রমণীর বিচিত্র রূপ জীবনে আমি বারবার দেখেছি—কখনো প্রেমময়ী—কখনো ছলনাময়ী—কখনো মমতাময়ী। কখনো বা অশ্রুময়ীর এমন রূপও দেখেছি যা জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারি নি, আমার মনের পটে আজও তা উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে। জীবনে দুঃখও পেয়েছি, সুখও পেয়েছি। দারিদ্র্যের চাবুকে রক্তাক্ত হয়েছি, আবার প্রেমালিঙ্গনে রক্তিমও হয়েছি। কিন্তু জীবনের প্রদোষলগ্নে মাতৃরূপা রমণীর দু-একটি স্নেহ-স্মৃতি আজও আমার জীবনে পাথেয় হয়ে আছে।' কিন্তু শুধু ভাবালুতা নয়, এই মাতৃমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেই মহাস্থবিরের জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে—'সবার শেষে দেখলাম আমার সেই অরণ্যমাতাকে। দীর্ঘ কৃশদেহ, জীবনব্যাপী কঠোর শ্রম ও অর্ধ-উপবাস-জনিত কঠিন মুখমণ্ডল। দেহের উত্তরার্ধ এবং নিম্নার্ধ প্রায় উলঙ্গ। সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত, যেন বর্তমানকে উপেক্ষা করে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে সে-দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে।...হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এইখানে একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় অরণ্যমাতার জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেখানে তারই সেবায় ও যত্নে প্রাণ ফিরে পেয়ে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—এদের কল্যাণের জন্যই আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করব।' এখানে ডিকেন্সীয় ভাবপ্রেরণার সন্ধান সম্ভব —trying hard to know her humbler fellow-creatures and to beautify their lives of machinery and reality with those imaginative graces and delights, without which the heart of infancy will wither up, the sturdiest physical manhood will be morally stark death, and plainest national prosperity figures can show, will be writing on the wall—she holding this course as part of no fantastic vow, or bond, or brotheahood, or sisterhood, or pledge, or convenant, or fancy dress, or fancy fair; but simply as a duty to be done—did Louisa see these things of herself? These things were to be. (*Hard Times*) আমাদের মনে পড়বে প্রেমাঙ্কুর শুধু গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ্‌স' অবলম্বনে বাঙলা নাটক লেখেন নি, তিনি এক সময় "ভারতী" পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধে রুশ সাহিত্যের ধারা (১৩২৫-২৭) নিয়ে আলোচনা করেছেন। "অচল পথের যাত্রী" উপন্যাসের নায়ক কারাবাসকালে

পাদরিকে বলে—'জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদীই তেমন সাংঘাতিক চরিত্রের লোক নয়। অবিশ্যি এদের মধ্যে অনেকে আছে, চুরি করা যাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু অনেকে অবস্থায় পড়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছে। সে রকম অবস্থায় পড়লে আপনি আমিও চুরি অথবা কোনো রকম অন্যায় কাজ করে ফেলতে পারতুম। সেই রকম অবস্থায় লোককে যাতে না পড়তে হয়, সে রকম ব্যবস্থা আপনি কিছু করতে পারেন কি?

'আমার কথা শুনে পাদরি মহাশয় কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে বললেন—কিন্তু এরা যদি প্রভু যীশুর আশ্রয়ে আসে তাহলে এদের সুমতি হবে।

'আমি বললুম—কিন্তু, এদের দুর্মতিটা আপনি দেখলেন কোথায়? বেঁচে থাকবার চেষ্টা করাটা কি দুর্মতি হলো?

'—তাহলে এর কি উপায় হতে পারে বলুন! আপনি কি বলতে চান যে, দেশে ধনী দরিদ্র কিছু থাকবে না। বড় লোকেরা গরীবদের কাছে তাদের ভাণ্ডার খুলে দেবে?

'পাদরি মহাশয় যে এত শিগগির হাল ছেড়ে দেবেন তা আমি ভাবি নি। তাঁর কথার মধ্যে একটা অসহায়-ভাব ফুটে উঠল, যা দেখে আমি না হেসে থাকতে পারলুম না।

'আমি তাঁকে বললুম—বড় লোকেরা গরীবদের কাছে তাদের ভাণ্ডার লুটিয়ে দিক আর না দিক সে তাদের ইচ্ছা, কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রের গঠন মানুষকে অপরাধ করতে উৎসাহিত করে, বাধ্য করে।

'পাদরি মহাশয় আর একবার শেষ চেষ্টার মতো বললেন—কিন্তু এই সব অপরাধীদের অন্তরে যদি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে নিশ্চয় এরা পাপ কাজ আর করবে না।

'আধ্যাত্মিক আহার না হয় আপনারা জোগাবেন। সঙ্গে যদি পার্থিব আহারের সুবিধা করে দিতে পারেন, তবেই আপনার আশা পূর্ণ হতে পারে, নচেৎ নয়।'

এইসব অংশ পড়বার সময় টলস্টয়ের রেসারেকশান্ উপন্যাসের কথা হয়তো মনে পড়ে (যদিও কারা-জীবনের বিস্তারিত বিবরণ বা আধ্যাত্মিক আর্তি প্রেমাঙ্কুরের উপন্যাসের অবলম্বন নয়)। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় শৈশবে পিতৃদেবকে দেখে যখন তাঁর মনে হয়েছিল 'মানবকুলের মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো [তিনি] অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন' কিংবা সেই সময়ের কোনো অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর মনে হয় 'এই অত্যাচারের মধ্যেই বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের বীজ প্রোথিত হয়েছিল'—তখন রোমান্স-কাহিনী রচনা তো নয়ই, এমনকী শুধু বিচিত্রলোকের পরিচয় দেওয়াও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, একালের বোধিসত্ত্ব যেন পারমিতার অনুষ্ঠানকল্পেই রচনা করেন গল্প ও উপন্যাস। জাতক-কাহিনী লাভ করে নতুন তাৎপর্য—এই জন্মেই ঘটে যায় জন্মজন্মান্তর॥

শতবর্ষের বৃদ্ধ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে ঔৎসুক্য আজো সমান জাগরুক

পুলকনারায়ণ ধর

একশ বছর ধরে কোনো ব্যক্তি যেমন একই ব্যক্তি থাকেন না একশ বছর ধরে কোনো দলও তেমনি একই চেহারায় থাকে না। কংগ্রেসের পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন: 'শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে, কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্বদাই আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া বাড়িয়া থাকে।'

কংগ্রেসের জন্মের একশ বছরের বেশি অতিক্রান্ত। আজ সে সজীব গাছ, না প্রাণহীন শুষ্ক কাষ্ঠ, তা একটি বড়ো প্রশ্ন। রাজনীতির ইতিহাস বা ইতিহাসের রাজনীতি সর্বদাই চলিষ্ণু প্রবাহ। দলের ইতিহাস একটি পরম্পরার ইতিহাস, বিশেষ করে সে দল যদি কংগ্রেসের মতো, একটি বিশাল বটবৃক্ষের মতো সর্ব-ভারতীয় দল হয়, যার আদিকাণ্ড হয়তো অনেকদিন আগেই শুকিয়ে গেছে, কিন্তু অজস্র শাখা-প্রশাখা মৃত্তিকাপ্রোথিত হয়ে থাকে আজও দণ্ডায়মান রেখেছে।

১৯৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একশ বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা একশ বছর বয়সের এই দলকে নানাভাবে আপাদমস্তক জরিপ করার সুযোগ পেয়েছেন। দেশে-বিদেশে ছোটোবড়ো নানা মাপের বহু আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনই একটি আলোচনার সুফল আমাদের উপহার দিয়েছেন পরিচিত ঐতিহাসিক ডি. এ. লো।

অক্সফোর্ডে সেন্ট অ্যানটনি কলেজে সেনটার অভ ইনডিয়া স্টাডিজ এবং সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে ওই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কর্ণধার ছিলেন ঐতিহাসিক ড. তপন রায়চৌধুরী। এই সম্মেলনে পরিবেশিত আলোচনা-পত্রগুলির মধ্য থেকে মোট দশটি প্রবন্ধ বাছাই করে ডি. এ. লোর সম্পাদনায় আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব আর ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষকরা অনেক আলোচনা করেছেন। নানা দিক থেকে বিচার করে ভারতীয় রাজ-নীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। অ্যানটনি কপলের (Antony Copley) বিশ্লেষণ কিন্তু নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করবে। তিনি ইতালির জাতীয়তাবাদ আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন কংগ্রেস সংগঠনকে কেন্দ্র করে। কপলে উভয় দেশের জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক আর সাংগঠনিক অভিন্নতা লক্ষ করেছেন। যেহেতু দুই দেশই বহুধা-বিভক্ত সমাজকাঠামোয় এক অভিন্ন এবং একাগ্র জাতীয়তাবাদের জন্য সংগ্রাম করেছে, সেই কারণে ভারত আর ইতালির মধ্যে সমান্তরাল রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু ইতালি যে অর্থে একীকরণের সংগ্রাম করেছে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রমুখরা সেই অর্থে কি ঐক্যের সন্ধানী ছিলেন? বোধ করি নয়। কপলের মতে, অবশ্য এটাই সবচেয়ে বড়ো সাদৃশ্য। এই অতি-সরলীকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করবার আগে আমাদের ঐতিহাসিকরা অবশ্যই দুবার চিন্তা করবেন।

ভারতীয় বা বঙ্গীয় রেনেসাঁস আর ইতালির নবজাগরণের মধ্যে আপাতসাদৃশ্য আবিষ্কার করা

The Indian National Congress—Centenary Hindsights. Ed. D.A. Low. Oxford University Press. Price : Rs. 180/-

গেলেও, দুই দেশের মানুষের আর সমাজের মানসিক গঠনে এতই ফারাক যে, এই সাদৃশ্যের কারণে এদের একাকার করে দেওয়া অর্থহীন। এই ধরনের তুলনা থেকে গভীর কোনো সূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে না। ম্যাৎসিনি আর গ্যারিবল্ডির দৃষ্টান্ত ভারতের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল ঠিকই। সাভারকরের (V. D. Savarkar)-এর মতো জাতীয়তাবাদী নেতা ম্যাৎসিনির জীবনী মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করে যুবকদের মধ্যে প্রচার করে দেশাত্মবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অরবিন্দ ও ম্যাৎসিনির দর্শন আর চিন্তাভাবনার সাযুজ্য বিচার করে উভয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করা ইতালির পুনর্জাগরণ ও ভারতীয় নবজাগরণের মধ্যে অতিরিক্ত অভিন্নতা আবিষ্কার-প্রচেষ্টার ফল অতিসংলীকৃত এবং কষ্টপ্রবর্ধিত চিন্তার ফসল।

দরিদ্র, অনগ্রসর এবং সামাজিক অস্থিরতার অনিশ্চয়তায় দীর্ণ দুটি দেশের বাহ্যিক বহু মিল থাকা সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা আর উগ্রজাতীয়তাবাদ ইতালির মতো ভারতেও দেখা গিয়েছিল—এ কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিলেও শুধু ইতালির সঙ্গেই এই ধরনের মিল খোঁজার চেষ্টা খুবই সংকীর্ণ গবেষণার দিক। এই ধরনের একটি রচনার স্থান পুস্তকটির গৌরব বৃদ্ধি করবে বলে মনে হয় না।

কংগ্রেসের উৎপত্তি আর অগ্রগতির ইতিহাস নিয়ে বহুদিন ধরে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকারের "রক্ষাকবচ" (সেফটি ভালভ) হিসাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। অধুনা এই "রক্ষাকবচ"-তত্ত্বটি পণ্ডিতরা নতুন গবেষণার আলোকে বর্জন করেছেন।

এডওয়ার্ড মোলটন আরো এক কদম এগিয়ে গেছেন। তিনি কংগ্রেসের উৎপত্তির সঙ্গে ইংরেজ আর আইরিশ চরমপন্থীদের যোগসূত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভারতীয়দের একটি রাজনৈতিক মুখপাত্রের (প্ল্যাটফর্ম) প্রয়োজন যে ইংরেজের মস্তিষ্কে প্রথম এসেছিল, তাঁর নাম অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ চরমপন্থী সাংসদ যোসেফ হিউমের পুত্র। ১৮৪৯ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসে কাজ করেও তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চরমপন্থী চিন্তাভাবনা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। লর্ড লিটনের সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৮২তে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা আর চিন্তাভাবনায় দীক্ষিত ভারতীয় অভিজাত ভদ্রলোকদের নিয়ে তিনি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির সংকল্প করেন। এই ব্যাপারে তিনি তদানীন্তন ভাইসরয় ডাফরিনের সঙ্গেও পরামর্শ করেন। হিউমের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, তা নিয়ে প্রথম সন্দেহের বীজ হিউম-ডাফরিন সমাচারের মধ্যে নিহিত ছিল। হিউম, চেয়েছিলেন, কানাডায় যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন ছিল, সেই ধাঁচের স্বায়ত্তশাসন ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত ভারতীয়দের একটি "সেকুলার" ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদের বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: 'The fusion into one national whole of all the different....elements that constitute the population of India.'

কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবার কথা ভারতীয় শিক্ষিতবাবুরা না ভাবলেও হিউমের চিন্তার বলয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়েছিল। ১৮৯১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে হিউম লিখলেন, 'অন্যান্য বিষয়ের উপরে জনগণের ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশা ও শান্তির ব্যাপারটি সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়।' তিনি ধনী এবং অভিজাত কংগ্রেস নেতৃবর্গকে পরিষ্কার ভাষায় কংগ্রেসের স্বৈরতান্ত্রিক পরিচালনপদ্ধতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'It is ill-adapted to the wants of the country.' হিউমের এই চিন্তাভাবনাকে কংগ্রেসের নেতারা গুরুত্ব

দিলেন না। ইংলণ্ডে হাইনডম্যান ও ভারতে তিলক এই বক্তব্য খোলাখুলি ভাবে সমর্থন করলেন। অন্যান্যরা ভাবলেন হিউম কংগ্রেসের গলা কাটতে উদ্যত হয়েছেন।

হিউম চেয়েছিলেন কংগ্রেসের ভিত্তিকে ব্যাপক জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তিনি কংগ্রেসকে যেভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, সেভাবে কংগ্রেসকে গড়তে পারেন নি। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক সংস্কার করতেও হিউম ব্যর্থ হয়েছেন। ১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের সর্বক্ষণের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় তিনি তাঁর ব্যর্থতার আর স্বপ্নভঙ্গের কথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

সম্ভাব্য বিপুল জনজাগরণের ঢেউকে প্রতিহত করার জন্য এবং ভারতীয় শিক্ষিত ধনী-শ্রেণীর মানুষদের ইংরেজ সরকারের বক্ষোলগ্ন করে রাখার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস সৃষ্টির প্রেরণা বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা হিউমের প্রতি অবিচার করছেন বলেই নতুন ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে রায় দিয়েছেন। হিউমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ যেসব ঐতিহাসিক পোষণ করতেন, তাঁদের মধ্যে দুই বিপরীত মেরুর ঐতিহাসিক—শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার আর রজনী পাম দত্তর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে ইংরেজ শাসনের দাপট এত তীব্র ছিল যে, কোনো ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করার কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে, শাসনবিভাগীয় আনুকূল্য লাভ করে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল বুদ্ধিজীবীদের ইচ্ছার দৌড়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯১৩ সালে বলছেন:

No Indian could have started the Indian National Congress.....If the founder of the Congress had not been a great Englishman and a distingnished ex-official, such was the distrust of political agitation in those days that the authorities would have at once found some way or the other of suppressing the movement. (A Centenary History of the Indian National Congress—Vol. 1, 1855-1919 p. 97).

এর ব্যতিক্রম অবশ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত হয়ে, ইংরেজের জেল খেটে (১৮৮৩) সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিদের ভয়ের কারণ ছিলেন। তাই হিউম তাঁর সাহচর্য আর সংযোগ এড়িয়ে গিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বরে কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের গুরুত্ব দেন নি, এডওয়ার্ড মোলটন এই বিষয়ে কোনো আলোচনা করেন নি, অথচ সময়ের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিউম বা তাঁর সহযোগীদের চেয়ে অনেক বেশি লড়াকু বা র‍্যাডিকাল ছিলেন। রচনাটি ঐতিহাসিক বিচারে অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়।

জিরালডিন ফরবেস জাতীয় কংগ্রেসে ভারতীয় নারীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (The Politics of Respectability : Indian Woman and the Indian National Congress).

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ফলে ভারতে নারীস্বাধীনতার যে আন্দোলন হয়, পরবর্তী কালে তা কংগ্রেস সংগঠনকে ভারতীয় নারীদের মধ্যে প্রসারিত হতে সাহায্য করে। স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, পণ্ডিত রামাবাঈ প্রমুখ মহিলারা ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। সমাজের অভিজাত মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদান এবং সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯০৫

সালে "বঙ্গভঙ্গ"বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ বাঙালি মহিলাদের রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ১৬ই অকটোবর সারা বাঙলায় "অরন্ধন দিবস" পালনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন বাঙালি মেয়েরা। ১৯০৭ সালের অগস্টে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাদণ্ড হলে ছ-শ মহিলা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর জননীকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত হয়েছিলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) ও আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীর নেতৃত্বে মহিলারা বিপুলভাবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। বহু মহিলা-সংগঠন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। কংগ্রেস নামক বড়ো প্ল্যাটফর্মটির অনেকটা জায়গা মহিলারা দখল করে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী মহিলা-কর্মীদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি আর কর্মসূচী নিজেরাই রচনা করেন —এ ব্যাপারে কোনো পুরুষের উপদেশ বা নির্দেশের অপেক্ষায় যেন মহিলারা না থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় নারীদের মুক্ত অঙ্গনে গান্ধীজীই প্রথম বিপুলভাবে নিয়ে আসতে পেরেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস দল দলীয় শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে এই নারীবাহিনীকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে দেশ-সেবিকা সঙ্ঘ (DSS) ও অন্যান্য মহিলা সমিতি-গুলির সঙ্গে সংঘাত হয়। অন্যদিকে, মহিলাদেরও কোনো পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে নি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মহিলারা কিভাবে নানা বাধা আর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ও কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন, তার বিবরণ এই রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক যুগের যাঁরা নারীমুক্তি নিয়ে আন্দোলন করছেন তাঁরা এই অতীত আন্দোলনের ইতিহাস থেকে যথার্থ শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

কিন্তু ফরবেস গোল বাধিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটিকে এ প্রসঙ্গে টেনে এনে। রাজনীতির সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করার বিপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সতর্ক করেছেন বলে লেখিকা মন্তব্য করেছেন (Rabindra Nath Tagore has emphasised the danger associated with woman's involvement in politics. [p 60])। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের এই ব্যাখ্যাটি যেন একবালতি দুধে একফোঁটা চোনা ফেলে দেওয়ার মতোন।

শহীদ আমিনের আলোচনা জাতীয় আন্দোলনের কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও কৃষকসমস্যা নিয়ে। কংগ্রেস, জাতীয় আন্দোলন ও ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যে ঐতিহাসিক গবেষণা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। স্থানীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে যে কৃষি-রাজনীতি গড়ে উঠেছিল, জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমিন তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার পক্ষপাতী। কৃষি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নানা শ্রেণী-আর গোষ্ঠী-স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত এবং নানা ঘটনাবলীর মধ্যেই আন্দোলনের উৎপত্তি আর গতি নিহিত। দেশে-বিদেশে ভারতীয় কৃষি বা কৃষক আন্দোলনের বিষয়ে গবেষণার ধারাগুলির অসম্পূর্ণতা আমিন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে বলছেন : Agrarian bases of nationalist agitations can be an interesting starting point, but it no longer needs to preoccupy us.

আমিনের আলোচনা অত্যন্ত উঁচু মানের এবং বিতর্কসাপেক্ষ।

ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ও জাতীয় আন্দোলনে বণিক কংগ্রেস ও ব্রিটিশ-বিরোধিতার ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ে আলোচনা করেছেন ডি. এ. লো। বণিক বা দেশীয় মূলধনী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্বকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কিভাবে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এবং জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি কিভাবে এই দ্বান্দ্বিক

সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, ডি. এ. লো তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। অসহযোগ বা আইন-অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেসকে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নানা-ভাবে সাহায্য করেছে, এই তথ্য আমাদের অজানা নয়। কিন্তু ১৯৩০-এর ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ভারতীয় রাজনীতিকে তথা কংগ্রেসকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডি. এ. লো বিশেষভাবে আলোচনা করলে রচনাটি আরো উন্নতমান অর্জন করত।

উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন অনিতা ইন্দর সিং তাঁর *'The Congress and the Hindu Muslim Problem'* প্রবন্ধে। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৭ সাল—এই সাতাশ বছরের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা কংগ্রেসকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে ; ধর্ম, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক, হিন্দু-মুসল-মানের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ব্রিটিশ ঔপনিবে-শিকদের এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ —এই সমস্ত বিষয়বস্তু তাঁর রচনায় তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন শুধু ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল—লেখিকার এই বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক হবে (it stirred religious rather than secular national consciousness among the Muslim masses [P 197])। খিলাফত আন্দোলনের 'গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' বর্শামুখটি কি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা সমীচীন ?

'প্রজাপার্টি'র কৃষক আন্দোলনও লেখিকার বিশ্লেষণে মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে আন্দোলন আর নির্বাচনে যোগ দিয়ে কংগ্রেস কার্যত মুসলমান-দের পৃথক রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সত্তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। লেখিকার মতে, ১৯৪৪ সালে জিন্না, গান্ধী আর রাজগোপালাচারীর মধ্যে "পাকিস্তান নীতি"র ভিত্তিতে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সেটাই কংগ্রেস-কর্তৃক কার্যত "পাকিস্তান"কে স্বীকৃতিপ্রদান।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধানকল্পে, কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের 'নেতৃবৃন্দে'র সঙ্গে এক-ধরনের রফা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় নি। আসল কথা হল, নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা হলেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা জন্মায় না। সে পন্থা আর পদ্ধতি ভিন্ন। মূলত নরমপন্থার আন্দোলনের নায়ক কংগ্রেসের দ্বারা তা সম্ভব ছিল না। নেতৃত্বের ঐক্য সর্বদা এবং নিশ্চিত-ভাবে জনগণের ঐক্য সৃষ্টি করে নি। পক্ষান্তরে, জনগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির পেছনে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের বিরোধই বড়ো ভূমিকা পালন করে। তবুও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে না ওঠার জন্য, এবং এই কারণে দেশভাগ হবার ফলে শুধু কংগ্রেসই দায়ী কিনা—এ প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়।

ভারতীয় জনসমাজ ধর্ম এবং নানা ভেদবুদ্ধির জালে এমনই আবদ্ধ যে, কংগ্রেস বা কোনো রাজ-নৈতিক দলের পক্ষে একটি সেক্যুলার ভিত্তি স্থাপন করা ও বিরুদ্ধে (?) ধর্মের মানুষদের এক জায়গায় দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন কাজ। একদিকে "শুদ্ধি" আন্দোলন ও অন্যদিকে "তবলিগ" ও "তানজিম" আন্দোলন রাজনীতিকে কিভাবে কলুষিত করেছে, সে সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন বি. ডি. গ্রাহাম তাঁর *Congress and Hindu Nationalism* প্রবন্ধে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে কংগ্রেস কতটা অসহায় ছিল, গ্রাহাম দীর্ঘ আলোচনায় তা বিশ্লেষণ করেছেন।

হিন্দু মহাসভার তত্ত্বাবধানে ও আদর্শে সৃষ্ট *Congress Nationalist Party (CNP)* কংগ্রেসের হিন্দু সভ্যদের অনেকেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। ১৯৩৪ সালে নির্বাচনে অনেক কংগ্রেস সদস্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে একটা রফাও করেছিলেন। কংগ্রেস তখন

অসহায় ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেছিল মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যবাদী নেহরু ও হিন্দুত্ববাদী বল্লভভাই প্যাটেলের দ্বন্দ্ব—কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে আর. এস. এস. (RSS) আর কংগ্রেসের দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলিত রূপ। এই দুই নেতার দুই দৃষ্টিভঙ্গি আজ একশ বছর পর কংগ্রেসে নতুন করে অনুপ্রবেশ করেছে, এবং হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে আবার দেশকে উদ্বেগ আর দুর্ভাবনার কিনারায় নিয়ে এসেছে। কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে অন্যতর রাজনীতিচর্চায় আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।

মনেপ্রাণে আর বিশ্বাসে যিনি ছিলেন পাশ্চাত্য-ধর্মী ও আধুনিক মানুষ, যিনি স্বাধীন ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সম্পদ হতে পারতেন, সেই মহম্মদ আলী জিন্নাকে কংগ্রেসের হিন্দু মানসিকতার তামস আর অন্তর্দ্বন্দ্ব কিভাবে দূরে নিক্ষেপ করেছিল, তার বিস্তারিত ও গভীর বিশ্লেষণ করেছেন শরীফ অল মুজাহিদ। জিন্নাকে জওহরলাল নেহরুর মতন নেতাও মেনে নিতে পারেন নি। জিন্না কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় রাখার। কংগ্রেসের একটা শক্তি জিন্নাকে অপাংক্তেয় করার চেষ্টা করেছেন—যা জিন্নার আহত অভিমান কখনই মেনে নিতে পারে নি।

কিন্তু গান্ধীজী আর জিন্নার সম্পর্ক নিয়ে লেখক বিশেষ আলোকপাত করেন নি। গান্ধীজীকে জিন্না খুব একটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু কেন? লেখক তা আলোচনা করেন নি। তিনি কি গান্ধীজীর পাশ্চাত্যবিরোধী মনের কাছে সহজ হতে পারতেন না? অথবা স্বয়ং নিজেকে গান্ধীজীর বিকল্প বলে কল্পনা করতেন? মৌলানা আজাদ, গান্ধীজী আর খান আবদুল গফফর খানও জিন্নার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন নি। এটি এঁদের ব্যর্থতা। কিন্তু জিন্নার ভূমিকা কি এখানে সম্পূর্ণ বিতর্কের ঊর্ধ্বে? এসব প্রশ্নের আলোচনা না থাকায় উজ্জ্বল নিবন্ধটি কিছুটা একদেশদর্শিতায় দুষ্ট।

১৯৬৭ সালের পর পরিবর্তিত ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিতে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলের গঠন এবং জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক কৌশল আলোচনা করেছেন মীনাক্ষী জৈন। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে জাতি-প্রথার প্রভাব ও কার্যকারিতা কংগ্রেসের সংগঠন ও রাজনীতিকে কিভাবে পরিবর্তন করেছে, সে-বিষয়ে লেখিকা আলোকপাত করেছেন।

লেখিকা প্রধানত নির্ভর করেছেন তাঁর পূর্ব-সূরীদের তথ্য ও মতামতের উপর। রালফ-মেয়ার, স্টেনলে কোচানক, পল ব্রাস, জেমস মেনর,—এঁদের গবেষণার সুন্দর মূল্যায়ন আমরা এই প্রবন্ধটিতে পাচ্ছি।

বস্তুতপক্ষে, ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা তথা-কথিত বাম প্রগতিমার্গী দল ও আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস দলের ভাঙাগড়ার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হচ্ছে। কংগ্রেসের তীব্র অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব ও শিবির পরিবর্তন ভারতীয় সমাজের উত্তরোত্তর বলপ্রাপ্ত জাতিভেদ ও জাতিবিদ্বেষের এবং আর্থ-সামাজিক অস্থিরতারই পরিচয়। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের মডেলে পুরোপুরি সর্বভারতীয়-দল-পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন প্রতিজ্ঞা। তাই কংগ্রেস একটি পরিবার বা একজন নেতার ক্যারিসমা নামক বোতলের (bottle-neck) ফাঁসে আটকে থাকতে বাধ্য হয়। জাত-পাতের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির অঙ্ক মেলাতে ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীকে বারবার মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বা ক্যাবিনেট মন্ত্রী পরিবর্তন করতে হয়েছে; এরা সবাই ইন্দিরা বা রাজীব গান্ধীর মনঃপুত ব্যক্তিগত মুনসি ছিলেন তা মনে করার কারণ নেই। ধর্ম ও জাতপাত-ভিত্তিক ভারতীয় রাজ-নীতির বাধ্যবাধকতা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গৌণ করে দিয়েছে।

১৯৬৭-র পর কংগ্রেসের ভাঙনে দেশের রাজ-নীতির অস্থিরতা, বিকল্প সরকার গঠনের পরীক্ষা (১৯৭৭) এবং সর্বোপরি ১৯৯০-এ কংগ্রেসের পরাজয়

—এসব সত্ত্বেও জাতপাতনির্ভর দড়ির খেলাতে পশ্চিমী ধাঁচের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ তামাম ভারতবর্ষের ১০০ বছরের বিরাট বটবৃক্ষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

হিউম থেকে রাজীব গান্ধী—এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় কংগ্রেস আজ অবসন্ন খণ্ড বিখণ্ডিত, মঞ্চ দখলের যুদ্ধে পর্যুদস্ত। কিন্তু ইতিহাসের আপাত খণ্ডবিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলির মধ্যে নিজের অজান্তেই কংগ্রেস একটি মহাভারত রচনা করেছে। যার ধারা যন্ত্র নদীর মতো বহু মানুষের মধ্যে আজও সতেজ প্রবহমান এবং যা শুধু কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া সম্পদ নয়। এই কারণেই ক্ষমতার জন্য যারা কংগ্রেস ভেঙে ফেলতে চঞ্চল হয়ে ওঠেন তাঁরা 'ব্যক্তি' নেতা বা পারিবারিক শাসনের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ান। ভারতের বুর্জোয়া ও ভূস্বামী শ্রেণী কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে নতুন কংগ্রেসই সৃষ্টি করছে; প্রগতি-মার্গী বামদলের ভরসা তাদের বড়ো বেশি নেই।

কংগ্রেসের বিরোধিতা করে অকংগ্রেসের জন্ম হয় না। কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে আজ কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা নতুন কোনো দল বা নেতা অস্বীকার করার সাহস প্রদর্শন করেন না। তাই ১০০ বছরের বৃদ্ধ কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেকের আশা ভঙ্গ হলেও বর্তমান রাজনীতির রঙ্গশালায় সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগরূক রেখেছে।

প্রায় একশ বছর আগে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বিভেদমান কংগ্রেসিদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'কংগ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কংগ্রেসের মঞ্চে বসিয়া করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে গিয়ে সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কংগ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে···তাহাকে এ বৎসর বা ও বৎসর কোনরকমে দখল করিয়া বসিব এই চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে, যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।' আজ শতবর্ষ পরে কৌতূহলভরে কংগ্রেসের ইতিহাস পাঠ করতে বসে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক আর সত্য বলে মনে হয়।

হিতকরী সভা : একটি মূল্যায়ন

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এমন বহু সংগঠন গড়ে উঠেছিল যেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো। সংগঠনগুলি মূলত কলকাতা-শহর-কেন্দ্রিক হলেও, কলকাতার বাইরে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কম ছিল না। আবার বহু সংগঠন কলকাতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজস্ব ধারা বজায় রেখে পল্লবিত হয়ে ওঠে। এই ধরনের একটি সংগঠন উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা। অধ্যাপক বসন্তকুমার সামন্ত এই সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর বর্তমান বই "হিতকরীসভা স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"-এ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'নিবেদনে' তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বিবরণীগুলি যত্ন-সহকারে রক্ষিত হয় নি।' (পৃ ৪।০)। আমাদের দেশে ইতিহাসের উপাদান রক্ষায় অনীহা নতুন নয়। উপাদান-অবলুপ্তির ফলে যথার্থ ইতিহাসচর্চায় লেখককে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে লেখককে পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে বেশি। প্রত্যক্ষ তথ্য যা পেয়েছেন তার যথাযথ ব্যবহার করেছেন।

বইটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত—১. বন্দিনী-

হিতকরী সভা স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—বসন্তকুমার সামন্ত। সাহিত্যলোক, কলকাতা। ত্রিশ টাকা।

বামা-মুক্তিসংগ্রাম এবং অসাধারণ একটি সংস্থা, ২. বাংলার নব্য সংস্কৃতি : উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা, ৩. বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার : হিতকরী সভার অবদান, ৪. ভারতে কৃষি-শিক্ষার অবস্থা : সভার অগ্রণী ভূমিকা, ৫. হিতকরী সভার সাহিত্যশাখা ও বার্ষিক অধিবেশন এবং ৬. বঙ্গে নবচেতনা : উত্তরপাড়া হিতকরী সভার মূল্যায়ন। তা ছাড়া, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্ট এই বইতে সংযোজিত হয়েছে। পরিশিষ্টগুলি হল—১. উত্তরপাড়া হিতকরী সভার নিয়মাবলী, ২. অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার ফল, ৩. ছাত্রী-বৃত্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী, ৪. ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সভ্যতালিকা এবং ৫. প্যারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইল।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সংস্থা 'হিতকরী সভা' নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার তথা সমাজসংস্কার। এ ব্যাপারে বাঙলার শিক্ষা-অধিকর্তা, শিক্ষা-পরিদর্শক, বিদ্যালয়-পরিদর্শক এবং মেরি কার্পেনটারের মতো শিক্ষাবিদ ও সমাজমনস্ক মানুষদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে লেখক নারীমুক্তি আন্দোলনে হিতকরী সভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য হারবার্ট জন রেনল্ডসের সমাবর্তন-ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার গৌরবজনক দিকটি দেখানো হয়েছে।

নারীশিক্ষা তথা নারীমুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙলার নব্য সংস্কৃতিতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ভূমিকাও এই বইতে আলোচিত হয়েছে। ১৮৫৩ সালে যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে "উত্তরপাড়া সমাজ" এবং তার বছর চারেক বাদে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "উত্তরপাড়া অ্যাসোসিয়েশন" গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সংস্থা দুটির আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অবশেষে ৫ এপ্রিল ১৮৬৩-তে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক সামন্ত তাঁর বর্তমান বইটিতে নানা তথ্যের সাহায্যে হিতকরী সভার সঠিক প্রতিষ্ঠাদিবসটি উদ্ধার করেছেন। এতদিন পর্যন্ত মেরি কার্পেনটার, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখদের মতে হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৪ সাল বিবেচিত হত। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য অধ্যাপক সামন্ত ধন্যবাদার্হ। যাই হোক, এই সভার উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রদের শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দান, বস্ত্রহীনদের বস্ত্রদান, অসুস্থদের ঔষধ-পথ্যের এবং গরিব বিধবা ও আশ্রয়হীনদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। অধ্যাপক সামন্ত লিখেছেন, 'বিশেষভাবে লক্ষণীয়—সভার নিয়মাবলী রচনা করার সময় প্রথম বৎসরের বিবরণীতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের কিছু সংকোচ সাধন করা হলেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মসূচী যোগ করা হয়েছে। সেটি—স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার। নূতনভাবে সংশোধিত এই কর্মসূচিই বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে উত্তরপাড়া হিতকরী সভাকে শ্লাঘনীয় মর্যাদার অধিকারী করেছিল।' (পৃ ১৩)। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অনেক আগেই জয়কৃষ্ণ অনুভব করেছিলেন। সেটা ১৮৪৫ সাল। কিন্তু শিক্ষাসংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নব্য সংস্কৃতির যে জোয়ার এসেছিল, তা থেকে উত্তরপাড়া পিছিয়ে ছিল না। হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই সেখানে নব্যসাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ হতে থাকে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক বিবিধ রকমের কাজ হিতকরী সভার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সাধারণ শাখার অন্য কর্মসূচি ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়েছিল তার শিক্ষাবিস্তারচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে। তা ছাড়া সভার সীমিত তহবিলও বহুবিধ কাজ করার পক্ষে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল।' (পৃ ২৪)।

উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে খ্রীষ্টান মিশনারি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কিছু-কিছু ব্যক্তিগত

উদ্যোগে বাঙলায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হয়েছিল সন্দেহ নেই। 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভার কার্যাবলীর সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ—স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসার প্রসঙ্গে তার কর্মপ্রবাহ।' (পৃ ২৫)। অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারকল্পে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মোদ্যোগ উল্লেখনীয়। এর পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগ ও কর্মধারা সম্পর্কেও অধ্যাপক সামন্ত এই বইতে সংগত কারণেই তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এবং তিনি দেখিয়েছেন, 'স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে যেসব সংস্থা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্যাপকতা ও স্থায়িত্বের দিক থেকে উত্তরপাড়া হিত-সভা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য।' (পৃ ৩৪)। ১৮৬৫ সাল থেকে হিতকরী সভা 'দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য···তিনটি বৃত্তি পরীক্ষা' নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কৃতী ছাত্রীদের বৃত্তি ও পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরপাড়া এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির ছাত্রীরাই এই বৃত্তি পরীক্ষা দিতেন। বৃত্তি ও পারিতোষিক দানের মধ্য দিয়ে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মানোই ছিল হিতকরী সভার উদ্দেশ্য। একই উদ্দেশ্যে একই ধরনের সভা মফসসলের আরো কোথাও-কোথাও, বিশেষ করে ফরিদপুরে সুহৃদসভা এবং বাখরগঞ্জে হিতৈষিণী সভা গড়ে উঠেছিল। হিতকরী সভা ১৮৬৮ সাল থেকে বামাবোধিনী সভা ও ব্রাহ্মবন্ধু সভার মতোই বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার পরীক্ষাকে তখন অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা বলা হত।' (পৃ ৩৮)। তবে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে নি। কারণ, 'তখনকার সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে অনাগ্রহী দৃষ্টিভঙ্গী।' (পৃ ৪১)। অধ্যাপক সামন্ত তাঁর বইতে হিতকরী সভা-পরিচালিত নিম্নপ্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মধ্যবাঙলা ও অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উত্তরপত্রের নমুনাও আছে। পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরপত্রের সঙ্গে-সঙ্গে পাঠক্রমও ছাপা হয়েছে। এগুলি থেকে তখনকার শিক্ষার মান সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি।

শুধুমাত্র স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারই হিতকরী সভার লক্ষ্য ছিল না। 'বঙ্গে প্রথম কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রাপ্য।' (পৃ ৬৯)। এই সভা ১৮৬৩ সালেই বৃত্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মালখা পেজানট বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ ব্যাপারে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি-খামার, নতুন-নতুন ফসল ও চাষ-পদ্ধতি কৃষির ক্ষেত্রে যুগান্তর আনতে পারত, কারণ, 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভার যুবক সভ্যবৃন্দের কেহ কেহ পূর্বেই উইলিয়ম কেরী ও উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কৃষি-বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে উৎসাহিত হয়ে কৃষিশিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবনা শুরু করেছিলেন।' (পৃ ৭১)। কিন্তু জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষক পরিবারগুলি উক্ত বিদ্যালয় সম্পর্কে অনাগ্রহী হওয়ায় এই গৌরবজনক প্রয়াসের অবসান ঘটে। বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। মাখলা কৃষিবিদ্যালয় ছাড়াও পরবর্তী কালে কৃষি-শিক্ষার জন্য বাঙলায় দু-একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ফল দেখাতে পারে নি। 'তবু হিতকরী সভার সভ্যদের উৎসাহের ফলশ্রুতিতে কিছু সাড়া মিলেছিল।' (পৃ ৭৬)। অধ্যাপক সামন্ত মাখলা কৃষিবিদ্যালয়ের প্রথম বছরের প্রশ্ন-উত্তরের একটি নমুনা উদ্ধৃত করেছেন। এর থেকে সেকালের কৃষিশিক্ষার মান সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি।

হিতকরী সভার একটি সাহিত্য-শাখা ছিল। 'শাখার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভার উদ্দেশ্যসাধক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতাদানের মাধ্যমে সভার সভ্যদের এবং উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের

মানসিক জাগৃতি বিধান।' (পৃ ৮১)। অনেক বক্তা নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। অধিকাংশ বক্তৃতাই ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী, বার্ষিক-বিবরণীগুলিও লেখা হত ইংরেজিতে। বোঝা যায়, ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য ছিল হিতকরী সমিতিতে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় চিন্তনের ক্ষেত্রে যে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, তাতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বিশেষ ভূমিকার কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। অধ্যাপক সামন্ত এই অধ্যায়ে হিতকরী সভার একটি সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন। 'দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য সভা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছেন। সেই-সকল হিতকর কার্যাবলী অবশ্যই প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা, সভার রাজনৈতিক মতাদর্শ জাতীয় চেতনার অনুবর্তী ছিল না। শোষক বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে হিতকরী সভা সমর্থন করেন নি, বরং নিন্দাবাদ করেছেন তেমন ক্ষেত্রে।' (পৃ ৯৯)। সেকালে হিতকরী সভার মতো আরও কিছু সংস্থার সন্ধান মিলবে যাদের উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণ হলেও শোষক ব্রিটিশ সরকারের তারা সমর্থক ছিল। এ তো গেল অরাজনৈতিক সংস্থার কথা। রাজনৈতিক সংস্থা জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের ভূমিকাই বা এমনকী গৌরবজনক ?

এই বইয়ের পাঁচটি পরিশিষ্ট খুব মূল্যবান। সেকালের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলি স্বীকৃত। অধ্যাপক সামন্ত এই তথ্যগুলি ছাপিয়ে দিয়ে ইতিহাস-অনুসন্ধানীদের উপকার করেছেন।

ইদানীং আমাদের দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার রেওয়াজ হয়েছে। বর্তমান বইটিকে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ইতিহাস বললে সুবিচার করা হবে না। উত্তরপাড়া এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা হিতকরী সভার ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে এই বইতে। এবং তা গোটা বাঙলার সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। এইটি বইটির গুণ। লেখক তথ্য হিসেবে অনেক ইংরেজি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। সেগুলি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। তবে প্রবন্ধের মধ্যে ইংরেজি উদ্ধৃতির বাঙলা তর্জমা এবং মূল ইংরেজি পাদটীকায় রাখলে, আমাদের মতে, ভালো হত।

বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যসমীক্ষা

গৌতম নিয়োগী

আহমদ ছফা অধুনা বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী। তাঁর "বাঙালী মুসলমানের মন" শীর্ষক শিরোনাম-প্রবন্ধসহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বাঙলা প্রবন্ধ-গ্রন্থটি ইতোমধ্যেই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে বিদ্বৎ-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সম্প্রতি ওপার-বাঙলার বইটি কলকাতা থেকে নতুন সংস্করণে নবরূপে মুদ্রিত হয়েছে। নবরূপে, কেননা ঢাকা সংস্করণের তিনটি রচনা বর্তমান সংস্করণে লেখক 'অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায়' বাদ দিয়েছেন এবং "গ্যোতের সার্বজনীনতা" শীর্ষক একটি নতুন লেখা সংযোজন করেছেন। আহমদ ছফা বর্তমান গ্রন্থে মোট ন-টি প্রবন্ধ সংগ্রথিত করেছেন, যার মধ্যে জর্মন কবি গ্যয়টে এবং ইংরেজ দার্শনিক বারট্রানড রাসেল সম্পর্কিত দুটি রচনা বাদ দিলে বাকি প্রত্যেকটিই বাঙালি সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক সমীক্ষা। সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যাপক ধীরানন্দ রায় এই গ্রন্থটিতে "ভূমিকার পরিবর্তে" নামক যে মুখবন্ধটি লিখে দিয়েছেন, তাতে মন্তব্য : 'বাঙালী-মুসলমানের মন—সমস্যা-আকীর্ণ সংস্কৃতির এক অভিনব পন্থানুসন্ধান…পূর্ব বাংলার ভাবনার শরিক যে পশ্চিমবাংলাও, একথা প্রমাণিত হল তখনই, যখন দেখি, কলকাতার এক প্রকাশক সংস্থা, ঢাকার নাগরিকের চিন্তাধারার মুদ্রণে আগ্রহী।' ওপারের বই এপারে ছাপা হওয়া মানেই যে ভাবনার শরিক হওয়া, আমি অতটা বলতে পারি না। তবে, একথা ঠিক যে কৃত্রিম বা ভৌগোলিক বা ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আত্মিক যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারে না, পারস্পরিক ভাববিনিময়ের অচ্ছেদ্য ধারা সে কথাই প্রমাণ করে। ভাবনা নতুন, যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে মুক্তমনে তা আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে কোনো বাধা দেখি না, এমনকী সহমত হলে গ্রহণ করতেও।

বাঙালী মুসলমানের মন—আহমদ ছফা। মিবান্দা, কলকাতা-৫৪। ১৩৯৫। তিরিশ টাকা।

২

"বাঙালী মুসলমানের মন"-শীর্ষক শিরোনাম-প্রবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থে শুধু আয়তনের দিক থেকে সবচাইতে বড়ো তাই নয়, বিষয়ের গভীরতায়, চিন্তার স্বচ্ছতায়, বক্তব্যের প্রাঞ্জল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণে সবচাইতে ভারী। বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়ে ওপার-বাঙলায় আহমদ শরীফ ছাড়া কারো লেখাতে এত স্বচ্ছ চিন্তা কম দেখেছি। আহমদ ছফার প্রবন্ধটি রীতিমতন উচ্চাঙ্গের। এই ধরনের লেখা শুধু পাণ্ডিত্যে হয় না, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মমত্ববোধ ও রসবোধ এবং মুক্তমন থাকাও জরুরি। ভাবতে ভালো লাগছে আহমদ ছফার তা আছে। অজস্র অভিনন্দন। মন বিশ্লেষণ ব্যাপারটি বেশ কঠিন। এই শব্দের ব্যঞ্জনায় শুধু মনস্তাত্ত্বিক দিক নিহিত নেই, আছে ইতিহাস, সমাজ, রীতিনীতি, নৃতত্ত্ব। সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তর্গত প্রায় সবকিছু। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হল লেখক ওই বিষয়ে শুধু অধ্যয়নই করেন নি, তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজের গড়ে ওঠা, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তার দোষ-গুণ, সবলতা আর দুর্বলতা—সবই তিনি বলতে পারেন স্পষ্ট দৃঢ় ভাষায়, প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন না। তিনি মন্তব্য করেছেন : 'বাঙালী মুসলমানের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালী হওয়ার জন্যও নয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুন তার মনের উপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সজ্ঞানে তার বাইরে সে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু বছরে কিংবা চার বছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী-মুসলমানের মনের ধরন-ধারন এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।'

ষোলো আনা খাঁটি কথা। একাজ কে করবেন ? আমার মতে যিনি বাঙালি তিনিই করবেন। এ কাজ করতে হবে মুসলমান সমাজকে। নিশ্চয়ই। একাজ করতে হবে হিন্দু সমাজকেও। এখানে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই। অবিভক্ত বাঙলায় বা স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাঙলায় বাঙালি হিন্দু সমাজ যে বাঙালি মুসলমানের 'মনের ধরন-ধারন এবং প্রবণতা-গুলো নির্মোহভাবে জানার' চেষ্টা করে নি, তা অনস্বীকার্য। আমার চোদ্দ পুরুষের দেশ পূর্ববাঙলার কথা আমি বাদ দিচ্ছি। অথচ এই জানাটা জরুরি ছিল, এমনকী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে দায়িত্বও ছিল বেশি। যে দুই সম্প্রদায় মিলে প্রধানত গড়ে উঠেছে বাঙালি সমাজ, একে অপরকে সত্যিকার জানব না, এই কূপমণ্ডূকতার খেসারত কি দিতে হয় না ? পারস্পরিক অবিশ্বাস যে এখনো এই বাঙলায় বেশ পরিমাণ আছে, তা তো ১৯৮৯-এর রাজনৈতিক নির্বাচনিক হাওয়াতেই টের পাওয়া গেছে। "সেকুলার" কথাটির তাৎপর্যের মধ্যেই পারস্পরিক জানার

আবশ্যিক শর্ত থাকে। আমি খুশি হতাম যদি আহমদ ছফা হিন্দুসমাজের এই অনুসন্ধিৎসা-হীনতার কথাও বলতেন।

তবে, মুসলমান সমাজও বাঙালি মুসলমানের মন বোঝার চেষ্টা করেন নি বা কী করণীয় সর্বদা তা বুঝতে পারেন নি। গত সাত-আটশো বছরের ইতিহাস ঘেঁটে আহমদ ছফা মশাই তা দেখিয়েছেন। এই বাঙলাতেই লেখাটির বিশেষ প্রয়োজন। 'বাঙালী মুসলমান কারা?' এই প্রশ্ন তুলে লেখক নিজেই জবাব দিয়েছেন: 'এক কথায় এর উত্তর বোধকরি এভাবে দেয়া যায়: যাঁরা বাঙালী এবং একই সঙ্গে মুসলমান তাঁরাই বাঙালী মুসলমান।' এই বাঙালি মুসলমানেরা যে 'ইতিহাসের আদি থেকে নির্যাতিত এক মানবগোষ্ঠী' লেখক তা দেখিয়েছেন। সমাজে ভেদাভেদটি আসলে সামাজিক প্রভুত্ব ও প্রতাপের অধিকারী মানুষদের সঙ্গে নীচু জাতিবর্ণ এবং শ্রেণীর। তাই মধ্যযুগে শাসকশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে দরিদ্র মুসলমানদের যা তফাত আর বৈষম্য, দরিদ্র হিন্দুদের সঙ্গে তা নয়। তা ছাড়া, বাঙলার মাটি, বাঙলার জল-আকাশ-বাতাসেই বাঙালি মুসলমানের মনের শিকড়; বাঙলা ভাষার তাঁর প্রাণ। বাঙালি মুসলমান সমাজের অধিকাংশই বাঙলার কৃষিভিত্তিক সমাজের লোক। বাঙালি মুসলমান সমাজও নিজেদের কর্তব্য সর্বদা নির্ধারণ করতে পারে নি, বা পারে নি চেতনার প্রসার ঘটিয়ে নিজেদের মানসিক জগৎকে মুক্ত করতে। লেখক একথা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, যুক্তিবাদ প্রভৃতি আধুনিকতার হাতিয়ার গ্রহণ না করে, ধর্মীয় পুনর্জাগরণের বাসনায় মত্ত থেকে, আকুল চোখে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে দেশজ সাংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার দিন কি শেষ হবে না? এককালে শাসকশ্রেণীর মুসলমানদের নকল করতে গিয়ে, বা আরবি-ফারসি-উর্দুর দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে বাঙালি নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে চলতে গিয়ে বাঙালি মুসলমান যে ভুল করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার একটাই পথ—বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিবাদ। লেখকের সাহসী উক্তি 'বাঙালী-মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে' (পৃ ২৬-২৭) সঙ্গত। বর্তমান সমালোচকের দৃঢ় অভিমত এই স্বাধীন চিন্তা আসতে পারে শিক্ষা থেকে যা আনে চেতনা, আর চেতনাই আনে ক্রান্তি।

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ ছফা "পদ্মানদীর মাঝি" উপন্যাসের হোসেন মিঞা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের একটি পঙক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য: 'রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা মানুষ হওয়ার প্রেরণা পাই' (পৃ ৫১)। গ্যয়টেকে তিনি দেখেছেন 'প্রাচ্য প্রতীচ্যের দুই বিরাট গরীয়ান সংস্কৃতির ধারা' যাঁর মানসসরোবরে এসে মিশেছে, তেমন মনীষীরূপে। শেখ মহম্মদ সুলতান এক প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী। তাঁর চিত্র-ঐতিহ্য নিয়ে লেখকের আলোচনা খুবই মনোগ্রাহী। এ বিষয়ে অন্য আলোচনা আমার জানা নেই। আশা করি বর্তমান সংকলনগ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

ছোটোদের হুমায়ূন আহমেদ

সনাতন মিত্র

ছোটোদেরকে গল্প চিরকাল বড়োরাই শুনিয়ে এসেছে—ঠাকুমা-দিদিমাদের ঘিরে বসেছে নাতি-নাতনিরা গল্প শুনবার জন্যে। আর, কাদের নিয়ে সেসব গল্প? তাতে ছোটোরাও থাকে, বড়োরাও থাকে। সেইসব

তোমাদের জন্যে রূপকথা—হুমায়ূন আহমেদ প্রতীক, ঢাকা। পঁয়ত্রিশ টাকা। **পুতুল**—হুমায়ূন আহমেদ। প্রতীক, ঢাকা। আটাশ টাকা। **বোতল ভুত**—হুমায়ূন আহমেদ। প্রতীক, ঢাকা। তিরিশ টাকা। **রাত বারোটা**—ইমদাদুল হক মিলন। প্রতীক, ঢাকা। বত্রিশ টাকা। **হাজীবাবা**—আহসান হাবীব। প্রতীক, ঢাকা। পঁচিশ টাকা।

গল্পের জগৎ ছোটোদের খুব চেনা, খুব কাছেরও হতে পারে, আবার আশ্চর্য, অচেনা রূপকথার জগৎও হতে পারে। কিন্তু গল্প যে বলবে, তাকে ছোটো হয়েই সে জগতে প্রবেশ করতে হবে, ছোটোদের চোখ দিয়েই দেখতে হবে তার রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্কস, কিংবা ইস্কুলের মাস্টারমশাই, বাড়িতে বাবা-মা, তার ভালোলোক, খারাপ লোক—সব-কিছুকে। ছোটোরা যে আলোতে দেখে, সেই আশ্চর্য মায়াবী আলোতে দেখতে হবে আমাদের এই অভ্যাসজীর্ণ, ধূসর পৃথিবীটাকে। তখন সেই পৃথিবীর আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-রোমাঞ্চ, তার ভয়ের শিহরণ, তার কৌতুকের বিফোরণ—সবই অন্য রঙে রাঙানো। ছোটোদের চোখে যে আলো, তাতে কোনো আবিলতা নেই, যে রঙ উদ্ভাসিত, তাতে কালিমা নেই; সবই নতুন, সবই ঝকঝকে। আরও মনে রাখতে হবে—ভাবালুতার কোনো স্থান নেই ছোটোদের জগতে, ভাবালুতা বড়োদের বিলাস, ছোটোদের নয়। দুঃখ অবশ্যই আছে, কিন্তু নুয়ে পড়া নেই।

হুমায়ুন আহমেদের গল্পের ডাইনি (কানী ডাইনি, তোমাদের জন্যে রূপকথা) বৃথাই ভয় দেখায়, বলে 'মানুষের গন্ধ পাঁও'; বলে, 'মন্ত্রবলে পাথর বানিয়ে দেব', কিন্তু কেউ তাকে ভয় পায় না, কেননা সে বেচারি সব মন্ত্র ভুলে গেছে, একমাত্র ঘরঝাড় দেওয়ার মন্ত্র ছাড়া। এখন সে শুধু মজার-মজার গল্প-বলে। এমন ডাইনিকে ছেলেমেয়েরা কেন ভালো-বাসবে না?

হুমায়ুন আহমেদ বড়োদের জন্যে ভালো-ভালো বই লিখে নাম করেছেন, কিন্তু ছোটোরাও কেন তাঁকে ঘিরে ভিড় জমায় তার কারণ স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর এই তিনখানি-বই পড়লেই। রানী কলাবতীর মুখের কালো দাগ কী করে মিলাল, বোকা দৈত্যের দৌলতে গরিব লোক কী করে বড়োলোক হল, আলাদিনের চেরাগের কেরামতি, বনের রাজার গুমোর ফাঁক—আরও কত মজার-মজার গল্প তিনি বলেছেন "তোমাদের জন্যে রূপকথা"-য়; আরও মজার বই "পুতুল"। তাতে একটিই বড়ো গল্প। বড়োলোকের ঘরের ছোট্ট ছেলে পুতুল, তার মনে সুখ নেই, তার অভাব আর কিছুরই নেই, খালি অভাব বেঁচে থাকার আনন্দের, ফূর্তির, বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরের পৃথিবীতে এসে সে দেখল—জীবনের কত বিচিত্র স্বাদ, কত মজা। সে নতুন বন্ধু পেল অন্তু, যে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত কাটায়, যার বাবা ভিক্ষে করে, সে জানে সাইকেল রিকশার চাকার হাওয়া কী করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে বের করে দিতে হয়, খালি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে কী মজার খেলা খেলা যায়। এমন ছেলে সে কখনো দেখে নি। সে পুতুলের চোখের সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিল। কিন্তু সবচেয়ে মজার বই "বোতলভূত"। একেবারে চেনা জগৎ। ইস্কুল, মাস্টারমশাই, অঙ্ককষা, বকুনি খাওয়া, বেত-খাওয়া, আবার তার মধ্যে এক আশ্চর্য "রবীন্দ্রনাথ"-এর আবির্ভাব, তাঁর কাছ থেকে "বোতল-ভূত" পাওয়া। সেই বোতলভূতের আশ্চর্য কার্যকলাপ। এতে আছে, গোপন কথা চেপে রাখতে না পারলে কী করতে হয়, কবিতা কখন বাসি হয়, সায়েন্সের ছাত্র হলে কী করতে হয়, এইসব খুব দরকারি কথা। এ বই হাতে নিলে এক নিঃশ্বাসে শেষ করতে হয়।

"রাত বারোটা"-তে তত মজা নেই, একটু যেন বড়োদের চোখে ছোটোদের দেখা। এতেও "রবীন্দ্রনাথ" আছেন, আর মহম্মদ আলিও আছেন, অসুস্থ শিশুর আরোগ্যের কথা আছে, কিন্তু গল্প কোনোটাতেই তেমন দানা বাঁধে নি, তার কারণ, লেখক মনের ভাবনাকে ঠিক মানবিক আকার দিতে পারেন নি।

বরং "হাজীবাবা" ছোটোদের ভালো লাগবে। ইস্পাহানের হাজীবাবা নানা রকমের বিপদ-আপদ, ঝামেলা ঝনঝাট কাটিয়ে কতকটা বুদ্ধির জোরে, কতকটা কপালজোরে, কী করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে

নিজের দেশে ফিরে এল, তার কাহিনী ছোটোদের টেনে রাখবে প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত। এ গল্পের দেশ আরব্যরজনীর দেশ। কাহিনীও আরব্য রজনীর ঢঙের। লেখা ঝরঝরে, তরতরে।

সব কথানি বইই, ছবিতে ছাপায়, বর্ণসমারোহে, ছোটোদের মন কাড়বার মতো।

নাটক

কোকিলারা: স্মরণীয় একক অভিনয়

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এই কলকাতায় আমরা বেশ কয়েকটি একক অভিনয়-এর নাটক দেখেছি যার স্মৃতি ধূসর হবার কথা নয়। তৃপ্তি মিত্রের "অপরাজিতা", শ'ওলী মিত্রের "নাথবতী অনাথবৎ" বা "কথা অমৃতসমান" কিংবা উষা গাঙ্গুলী বা তিজন বাঈ-এর একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকগুলির কথা প্রাসঙ্গিকভাবে মনে আসে। খুব সম্প্রতি আমরা দেখলাম বাংলাদেশের সুখ্যাত নাট্যসংস্থা "থিয়েটার" গোষ্ঠীর অনন্যসাধারণ এমনি একটি প্রযোজনা "কোকিলারা"। ফেরদৌসী মজুমদারের একক অভিনয় এককথায় চমৎকার—তিনি তিনটি ভিন্ন চরিত্রের সুখদুঃখ আনন্দবেদনা, সামাজিক ও ধার্মিক বঞ্চনার নানা মুড অনায়াসেই মূর্ত করে তুলেছেন। কোনো আপেক্ষিক আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়—তাঁর অভিনয় জীবন্ত, এবং তা এতটাই সার্থক যে চরিত্রগুলির ক্রোধ আর হাহাকার দর্শকদেরও বড়ো বেশি অপরাধী করে রাখে। আমাদের চারপাশের পৃথিবীর মালিন্যপ্রসূত শূন্যতা যে মহাশূন্যতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়—এই তীব্র বেদনাবোধ সঞ্চারিত করে মঞ্চের উপরে কান্নায় ভেঙে লুটিয়ে পড়ে থাকেন শিল্পী। ফেরদৌসী মজুমদারের চরিত্রের সঙ্গে এই একাত্মতা তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে শিল্পের নন্দনলোকে।

মঞ্চ অন্ধকার। ধীরে-ধীরে একটু-একটু আলো হতে থাকে। নেপথ্যে শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত। ভোর-বেলাকার রাগ। দর্শক বুঝতে পারে দিনের আলো ফুটল। আমাদের দেখা হয়ে যায় প্রথম কোকিলার সঙ্গে। মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশে জলভরতি বালতি নিয়ে সে প্রায় ছুটছে। গোসলখানায় পানি দিতে হবে—সারতে হবে দ্রুততায় রান্না। খালুজান আর খালুআম্মা কাজে বেরোবেন। ওদের ছোট্ট ছেলেটিও স্কুলে বেরুবে। বুঝতে পারি প্রথম কোকিলা কাজের লোক—ইংরেজিতে যাদের কিছুটা সম্মান করে বলা হয় domestic help। সবাই বেরিয়ে যাবার পর একটু ফুরসত পেয়েছে কোকিলা। সে এবার জীবনের গল্প বলতে বসে। সে গ্রামের মেয়ে। আব্বার মৃত্যুর পর আম্মা এক বৃদ্ধকে নিকা করলেন—কারণ 'পুরুষমানুষ ছাড়া মেয়েমানুষের চলে না।' এই একটি সংলাপেই স্বচ্ছ হয়ে যায় পুরুষশাসিত সমাজের চাপানো মূল্যবোধ। পরে অবশ্য কোকিলা রসিকতা করে বলেছে—'মেয়েমানুষ ছাড়া পুরুষমানুষের চলে না।' মানুষ এবং মানুষী যে একে অন্যের পরিপূরক—এই অন্তর্লীন সংকেত আমাদের গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে যায়। মায়ের নবীন স্বামী সেই বৃদ্ধ যখন একরাত্রে কোকিলার শরীর উপভোগ করতে এল, তখনি সে চলে এল ঢাকায় এ বাড়ির কাজ নিয়ে। বেশ কেটে যাচ্ছিল তার দিনগুলি রাতগুলি এদের বাচ্চাটিকে ভালোবেসে—আদর করে। সে এক নিশ্চিন্ত জীবন তার। কিন্তু ঝড় আসতে দেরি হয় না। এ বাড়ির তরুণ আত্মীয় আনোয়ার মাঝে-মাঝে আসে। সে সর্বহারার পার্টি করে। হায়! সেই প্রতারক। যৌবনের সহজ টানে কোকিলা ধরা দেয় মিথ্যে ভালোবাসার ফাঁদে। তার গর্ভ থেকে ছাড়পত্র খোঁজে আনোয়ারের অবৈধ সন্তান। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রভু ও প্রভুপত্নী সাজানো চুরির দায়ে ধরিয়ে দেয় তাকে। সে জেলে যায়। তারপর অনিঃশেষ বেদনা আর দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে রেলের তলায় আত্মহত্যা করে।

দশ মিনিটের বিরতির পর শুরু হয় দ্বিতীয় কোকিলার জীবননাটক। সচ্ছল উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীর বিবি শ্রীমতী খোন্দকার আমাদের দ্বিতীয় নায়িকা। বান্ধবী শ্রীমতী হোসেনের একটি ফোন এসেছে। সেদিনকার সংবাদপত্রের একটুকরো অবহেলিত খবর হল—প্রথম কোকিলার আত্মহনন, যেটি দ্বিতীয়

কোকিলা পাঠই করেন নি। আসলে এমনি হাজার-হাজার কোকিলা যে প্রায় প্রতিদিন গ্রামে-গঞ্জে-শহরে অবমাননার অন্ধকারে মরছে—তারই ইঙ্গিত দিয়ে দ্বিতীয় উপাখ্যানের সূত্রপাত। দুটি কন্যার জননী শ্রীমতী খোন্দকার ধর্মপরায়ণা মহিলা। প্রাথমিক-ভাবে তাকে বেশ ঢলঢল সুখী-সুখী মনে হয়েছে। বিয়ের পরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে স্বামীর সেবায়। স্বামীর ভোগের ইন্ধন হয়ে। অন্তঃসারশূন্য ব্যবসায়ী স্বামীর লোভ আর লাম্পট্য যে কত মাত্রা-ছাড়া তা বুঝতে তার কিছু দেরি হয়ে গেছে। আবার ফোন এসেছে শ্রীমতী হোসেনের কাছ থেকে। সুন্দরী একান্ত সহকারিণীকে নিয়ে স্বামী নাকি গিয়েছেন কক্সবাজারের সমুদ্র-উপকূলে। সেই রূপময়ীকেই নাকি স্বামী নিকা করেছেন। হাত থেকে টেলিফোন রিসিভার খসে পড়ে—দুটি চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় কোকিলার। এই অপমানের খবর সহ্য করতে পারে নি কন্যারা—তারা মাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছে মামার বাড়িতে। এতদিনের অধিকার ছেড়ে দেবে কোকিলা! মেয়েরা চলে গেলেও সে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে মিথ্যেবাদী স্বামীর মুখোশ খুলে পড়তে দেরি হয় না। দৈহিক অত্যাচারের পরে গৃহত্যাগের নির্দেশ আসে। দ্বিতীয় কোকিলা এবার তিল-তিল করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়।

পাঁচ মিনিটের বিরতি। এবার দেখা যায় তৃতীয় কোকিলাকে। সে প্রতিবাদের প্রতীক। এক মহিলা উকিলের পোশাকে তাকে দেখা গেল। মঞ্চের দুধারে দুটি শূন্য কাঠগড়া। একটিতে খোন্দকার আর অন্যটিতে আনোয়ার দাঁড়িয়ে আছে—এমন কল্পনা করে নিতে কোনো দর্শকেরই অসুবিধা হয় না। দুই ঘাতক অপরাধীর কঠোর দণ্ড প্রত্যাশা করে সওয়ালকারিণী তৃতীয় কোকিলা। প্রচলিত আইনে দুই অপরাধীর কোনোই সাজা হয় না। তাই সাধারণ মানুষের গণ-আদালতে পেশ করে তার দাবি বিচারপ্রার্থী তৃতীয় কোকিলা।

রচনা ও নির্দেশনা আবদুল্লাহ-আল-মামুন-এর। পুরুষের বর্বরতার নির্মম আলেখ্য হয়ে উঠেছে কোকিলারা। সেই সঙ্গে সমাজ আর ধর্মের লৌহনিগড় কেমন করে বন্দিনী করে রেখেছে নারীকে—তাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। পদে-পদে পলে-পলে নারীত্বের অবমাননার ধিক্কার এই নাটক। লেখা বাহুল্য, কাহিনী নতুন নয়, কিন্তু বিন্যাস এবং উপস্থাপনা অবশ্যই নতুনত্বের দাবি রাখে।

সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গও টেনে আনা হয়েছে কাহিনীটিতে যা খুব স্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে গেছে। কখনো-কখনো লঘু পরিহাস দমবন্ধকরা জীবন-নাটকে কিছুটা হালকা হাওয়া ভরে দিয়েছে। কিন্তু এই আপাত পরিহাসের বাতাবরণ কাহিনীকে ব্যাহত করে নি অথবা প্রক্ষিপ্ত বলেও মনে হয় নি। একজন নাট্যকারের পক্ষে এ নিতান্তই শ্লাঘার। অবশ্য কোথাও-কোথাও সংলাপে যে অতিনাটকীয়তা এসেছে, তা যেন লাগামছাড়া। প্রথম কোকিলার সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে যা নিন্দনীয় নয়, তা দ্বিতীয় কোকিলার ক্ষেত্রে কিছুটা বা বেমানান।

প্রথম কোকিলার কাহিনীটিই সবচেয়ে ভালো-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের টানটান নাটক উপভোক্তার মনে যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল, তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোকিলার আখ্যানের ক্ষেত্রে রক্ষা করা যায় নি।

কামরুজ্জমান রুনু আলোর ব্যবহার করেছেন যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে। কোথাও-কোথাও তাঁর কল্পনা-শক্তির প্রশংসা করতেই হয়। সঙ্গীতে নেপথ্যকণ্ঠ দিয়েছেন যথাযোগ্যভাবে ফাতেমা-তুজ-জোহরা ও সুবীর নন্দী।

অভিনয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। ফেরদৌসী মজুমদারকে ফিরে অভিনন্দন। তিনি যখন ঢাকাইয়া বাঙালভাষা ব্যবহার করেছেন তখন তাঁর স্বরপ্রক্ষেপণ মাধুর্যের মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে। আবার মার্জিত

বাংলায় অথবা ইংরেজিতে সংলাপ উচ্চারণ করেছেন তখন তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও অনুশীলনের পূর্ণতাকে সেলাম জানাতে ইচ্ছে হয়েছে। তবে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি পাঠের সময় মনে হচ্ছিল—কেউ যেন তাঁকে তাড়া করেছেন। প্রসঙ্গত, এই কবিতাটির প্রয়োগ বা শেক্সপীয়র-এর জুলিয়াস সিজার থেকে অ্যানটনির সংলাপের কিছুটা উদ্ধার কারো-কারো কাছে অতিরিক্ত মনে হলেও বর্তমান আলোচকের তা মনে হয় নি।

আশা করি, ঢাকার "থিয়েটার" গোষ্ঠী আবার তাঁদের সমাজমনস্ক নতুন নাট্যনিবেদন নিয়ে কলকাতায় আসবেন।

চিত্রকলা

বুদ্ধিমার্গের শিল্পী তায়েব মেহতা

সমীর ঘোষ

তায়েব মেহতা—এই নামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষের মাধ্যমে। কিন্তু শিল্পীর মূল ছবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ এতদিন হয় নি। পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত সামান্য কিছু ছবিতে শিল্পীর পূর্ব ভাবনার ইঙ্গিত মিললেও শিল্পী-ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ স্বাদ বা চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যনির্দেশ সম্ভব নয়। ১৯৬১ সালে অঙ্কিত "গ্রু ফেস" (ললিত-কলা কনটেম্পোরারি-৩) নামের ছবির নির্মাণবৈশিষ্ট্যে অবয়বধর্মিতার গুণ আছে। রেখার চেয়ে রঙের সাহায্যে তলবিভাজন উল্লেখ্য। মানবশরীরের উপস্থিতি তেমন তীব্র নাটকীয় নয়। শরীরী অঙ্কনে বিকৃতিকরণ থাকলেও, মুখাবয়বের ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে দৃশ্যগ্রাহ্যতা বর্তমান। অর্থাৎ, এক কথায়, "গ্রু ফেস" ছবির চারিত্রবৈশিষ্ট্যে সাম্প্রতিক ছবির কোনো লক্ষণ তেমন আভাসিত নয়। এই ছবির সাত বছর পরে "ফলিং ফিগার" (ললিতকলা কনটেম্পোরারি-৯) নামের ছবিতে শিল্পকৃতির চরিত্র অনেকাংশেই পরিবর্তিত। এই ছবিতেও সুস্পষ্ট রেখার পরিবর্তে বিপরীত ধর্মী রঙ ক্ষেত্রবিভাজনকে স্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করেছে। এখানে শরীরী কাঠামোর উপস্থিতি থাকলেও তা একদিকে যেমন সাদৃশ্যপ্রধান নয়, অপর দিকে বিকৃতিকরণ কোনো নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে বন্দী গঠন-নির্ভর নয়। অনেকাংশেই ব্যঞ্জনাপ্রধান। চাপ-চাপ রঙের কর্কশ অভিব্যক্তির পরিবর্তে সব মিলেমিশে সহাবস্থানে স্থিত। ফলে এই ছবির কোনো অংশই তেমন উচ্চাবচ নয়—সমতল। যদিও বিষয়ের উপ-স্থাপনায় নাটকীয়তা এবং জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাজনে পরিকল্পিত ভাবনার ইঙ্গিত মেলে। সাম্প্রতিক ছবির ক্ষেত্রনির্মাণের সঙ্গে এর তফাত অনেকটাই। সুনির্দিষ্ট রেখানির্ভর তলবিভাজনের পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে, বর্ণছায়ার ঈষৎ আলো-আঁধারি মায়াবিভ্রমে ছবি আবেগময়। পারস্পরিক আকর্ষে সোচ্চার। ১৯৭৩ সালের "গ্রু ডায়াগোনাল ৩-৪" নামের ছবিতে (ললিতকলা কনটেম্পোরারি—১৭) পূর্বের চরিত্র যেন বহুলাংশেই পরিবর্তিত। বর্গক্ষেত্র বা আয়তাকার পটের ডান থেকে বাঁ দিকের কৌণিক বিন্দু দুটিকে একটি তির্যক রেখায় পরিকল্পিত বিভাজন করে, দ্বিখণ্ডিত ক্ষেত্রে অবয়বকে স্থাপন করেছেন। শরীরী মূর্তির উপস্থিতি এখানে যথেষ্টই নাটকীয়। অবয়বগঠন যেন কাটা কাগজের সমতল রূপের সঙ্গে তুলনীয়। রেখা প্রায়ই সরল, ঋজু আর দৃঢ়। কখনো সামান্য বর্তুল রেখায় গতিচ্ছন্দের স্পর্শ—এভাবেই তিনি শরীরী সংস্থানকে টুকরো-টুকরো ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সংলগ্নে গেঁথেছেন। ফলে শরীরগঠনের সম্পূর্ণতা না থাকলেও এই বিকৃতিকরণ এক ভিন্ন জ্যামিতিক রূপান্বয়ে যুক্ত হয়েছে। রেখা কখনো শরীরী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিহ্ন-লক্ষণপ্রকাশক, কখনো অবয়বের নির্দিষ্টসীমানির্ণায়ক। গাঢ় আর হালকা রঙের পারস্পরিক ব্যবহারে প্রতিটি ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট। রঙের সমতল ব্যবহারে ক্ষেত্রতল নিপাট উজ্জ্বল। সামান্য ভিন্ন রঙের ছায়া কখনো বিস্তারী পটের স্থির মন্থরায় চঞ্চলতার স্পর্শ এনেছে। অবশ্য এসবই মুদ্রিত চিত্রের অভিজ্ঞতা। তবু শিল্পী তায়েব মেহতার বর্তমান ছবির বিষয়ে আলোচনার আগে নির্মাণের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি।

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১০-২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিল্পীর তেল রঙ এবং কিছু রেখাচিত্রের মোট একুশটি শিল্পসম্ভার প্রদর্শিত হল। কলকাতায় শিল্পী তায়েব মেহতার এই প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী। আমাদের শিল্প-অভিজ্ঞতায় এ এক নব্য সংযোজন।

তায়েব মেহতার প্রদর্শিত ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য জ্যামিতিক পটবিভাজন, ছায়াহীন সমতল উজ্জ্বল রঙের গাঢ় ব্যবহার এবং প্রতিটি চিত্রেই শরীরী অবয়বের সাড়ম্বর উপস্থিতি। শরীরের গঠনকে শিল্পী ভেঙেছেন পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার স্বরূপে, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে দেখা মুদ্রিত ছবির গঠনবৈশিষ্ট্য এখানেও বিদ্যমান। কিন্তু সাম্প্রতিক কাজে জ্যামিতিকরেখা-নির্ভরতা নিছকই আবেগহীন ঘেরাটোপে বন্দী নয়। বরং প্রয়োজনে শরীরের অঙ্গসংস্থানের যথাযথ ভাঁজকে তিনি বর্তুল রেখায় টেনেছেন। এবারের ছবিতে এসেছে পরিপ্রেক্ষিতনির্দেশক কিছু-কিছু ইঙ্গিত যা সাদৃশ্যচিহ্নবহ কিন্তু প্রয়োগপ্রাধান্যে সরলীকৃত। ফলে যান্ত্রিক আবেগহীন রূপারোপে যুক্ত হয়েছে কোমল অনুভূতির স্পর্শ। ছবির অবয়বধর্মী আকারকে প্রেক্ষাপটের সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাঁধলেও কখনো-কখনো পটের নির্দিষ্ট বর্ণময় ক্ষেত্রগুলি পরিপ্রেক্ষিতনির্দেশের আভাসবহ হয়ে উঠেছে। রঙ উজ্জ্বল আর গাঢ়, দৃষ্টির পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। ছবির পটভূমি সমতল হলেও বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব বর্তমান।

সাধারণ বিষয়কেই শিল্পী অবলম্বন করেছেন। কিন্তু পটে তাদের উপস্থিত করেছেন নানা নাটকীয় ভঙ্গিতে। যেমন "ফিগার উইথ বার্ড", "ওম্যান অন এ রিকশা", "ওম্যান উইথ গোট", "ড্রামার" প্রভৃতি ছবিতে সাধারণ দৃশ্যগ্রাহ্যতার সীমায় ছবির বিষয় নির্দিষ্ট। কিন্তু অবয়বের উপস্থিতি এবং গড়নের ছন্দে আছে শিল্পীর নিজস্ব রূপারোপ। স্বাভাবিক গঠন-রূপকে সামান্য মোচড়ে তিনি সহজেই ভিন্নরূপে বিকৃতি ঘটান। আর চেনা আদলের মধ্যেও তা হয়ে ওঠে অচেনা ভিন্ন এক-গঠন।

তায়েব মেহতার ছবি ভারতীয় চিত্রধারায় চর্চিত কোনো চিহ্নের অনুগামী নয়। এই ছবি বা ছবির নির্মাণভাবনা মূলত পাশ্চাত্য শিল্প-ধারা আর ধারণার নিকট সঙ্গী। ১৯০৭-এ কিউবিজম চিত্রনির্মাণরীতি সাদৃশ্যরূপের বিকৃতিতে যে চূড়ান্ত পথ খুলে দিয়েছিল, তা দেশে-বিদেশে নব্য শিল্পচেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। সচেতন কিংবা অবচেতনায় আমরা রূপারোপে এই ভাষাকে ব্যবহার করেই চলেছি। তায়েব মেহতার ছবির শরীরী নির্মাণের বৈশিষ্ট্যেও প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে কিউবিজমেরই মূলসূত্র। যদিও দেশকাল এবং বহমান সময়স্রোতে আজ তা অনেকটাই পরিশ্রুত পর্যায়ে গৃহীত।

শিল্পীর জ্যামিতিকনির্মাণ-নির্ভর ছবি সম্পূর্ণতই আখ্যান-বা কাহিনী-মুক্ত, এমন বলা যায় না। গল্প না থাকলেও বিষয়ভাবনায় দূরপ্রসারী ইঙ্গিত কাজ করে। ছবির নির্মাণের আড়ালে থাকে সমাজমনস্কতা। যেমন "কালী"-১, ২, ৩" "স্টাডিজ আফটার শান্তি-নিকেতন", "ফলিং ফিগার" এবং "গ্রু প্লে" নামের ছবিতে বিষয়ের টান অনুভব করা যায়। "কালী" চিত্রমালার তিনটি ছবিতেই প্রতিমার ভয়ঙ্কর উপস্থিতি প্রথাগত রূপভাবনাকেই স্মরণে আনে। পাশাপাশি কালীপ্রতিমার চিত্রকল্পে যুক্ত হয় সমসময়েরই কোনো বাস্তব সত্তা। এ যেন সুবর্ণরেখার ছোট্ট সীতার সামনে দাঁড়ানো বীভৎস কালীমূর্তি—যা আসলে ক্ষুধাতুর এক বহুরূপী মাত্র। কিন্তু ছবিতে শিবের উপস্থিতি রহস্যময়। কিংবা বলা যায়, প্রলয়মুহূর্তে শুদ্ধ শিব-চরিত্র যেন আবর্তনের টানে বিপর্যস্ত। এখানেও শিল্পী সংহারক শক্তির দুর্বার আকর্ষের পাশে পতনের মর্মন্তুদ বার্তাকে প্রকাশ করতে আগ্রহী। যেমন দেখি "গ্রু প্লে" ছবির বৃত্তাকার ঘূর্ণিতে শরীরের জটিল যন্ত্রাংশের রক্তমাখা রূপ যা জীবনের সার্বিক খেলারই

মূল অংশে জড়িত থাকে। এভাবেই শান্তিনিকেতনের সুস্থির ছন্দোলাবণ্যে শিল্পী আলোড়িত হন, তবু সমাজের সার্বিক অশান্তির পাশে দ্বীপময় শান্তিনিকেতনের সুস্থির নৃত্যছন্দে জাগে হঠাৎই রুদ্র-তাণ্ডবের ছোঁয়া।

তায়ের মেহতার ছবির এই কাব্যিক ব্যাখ্যা আমার অভিপ্রেত নয়। শিল্পীর বক্তব্য না জানার কারণে, অনুমাননির্ভর এই সাহিত্যভাবনা ছবির মূল গঠনবৈশিষ্ট্যকেই আহত করে। নির্মাণভাষার প্রকৃত উৎস থেকে স্বাদ গ্রহণে ভ্রষ্ট হই। সুতরাং শিল্পীর ছবির মূল রস তার কাহিনীতে নয়, উপস্থাপন ও গঠন-সৌকর্যেই নিহিত।

আধুনিক শিল্পভাষা দুটি প্রধান ধারায় যুক্ত। একটি আবেগনির্ভর, অন্যটি বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত আবেগ বা আবেগময় বৌদ্ধিক প্রয়োগও ছবির নির্মাণে সতত ক্রিয়াশীল। শিল্পীর ছবিতে আবেগ অপেক্ষা যুক্তিবুদ্ধির কঠোর অনুশাসন, প্রয়োগের একটি উজ্জ্বল দিক। সোচ্চার আবেগে শিল্পী কখনই পরিকল্পিত কাঠামোকে আলগা হতে দেন না। সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রপট এবং বিষয়ের রূপা-রোপকে গাণিতিক প্রথায় যেন বেঁধে রাখেন। প্রতিটি অংশই পূর্বনির্দিষ্ট এবং অতিসচেতন প্রক্রিয়ায় নির্মিত। আকস্মিকতার ছোঁয়ায় উত্থিত রূপাভাস পটে প্রকাশ পায় না। সেই কারণে তায়ের মেহতার ছবি সম্পূর্ণতই বুদ্ধিমার্গী।

তায়ের মেহতার দুটি ছবির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। "স্টাডিজ অভ বুল অন রিকশা" এবং "দ্য প্লে" নামের ছবি দুটি অন্যান্য কাজের তুলনায় কিঞ্চিৎ ভিন্নধর্মী। প্রথম ছবির ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক পটকে একত্রে জুড়ে একটি সার্বিক আকার দেবার চেষ্টা আছে। রিকশায় গবাদি পশু বহনের দৃশ্য শিল্পীর দৃষ্টিতে ভিন্নমাত্রায় অঙ্কিত। এখানে সাদৃশ্যধর্মিতা অপেক্ষা শরীরের রেখার জটিল ছন্দকে শিল্পী রূপারোপিত নকশায় প্রকাশ করেছেন। করেছেন। রিকশার চাকার বৃত্তাকার গঠন এবং পশুদেহের পুঞ্জীভূত পেশীর ভাঁজকে ছন্দোময় নিয়ন্ত্রণে বেধেছেন। পশুদেহের বৃত্তাকার বস্তুপুঞ্জে এসেছে ঘনত্বের আভাস যা তায়ের মেহতার দ্বিমাত্রিকতল-প্রধান চিত্রে এত প্রবল নয়। আর এই গঠনেই মেলে কিউবিস্ট রীতির প্রচ্ছন্ন ছায়া। "দ্য প্লে" ছবিতে শিল্পী তাঁর নিজস্ব অবয়ব গড়নের অদ্বয়ঙ্গে মিশিয়েছেন ব্রিটিশ শিল্পী ফ্রান্সিস বেকনের রক্তমাংসে জর্জর শরীরী চিত্রকল্প। এক সুস্থির নকশা নির্মাণে যুক্ত হয়েছে গতি আর অনুভূতির জৈবিক চাঞ্চল্য, যা তায়ের মেহতার অন্যান্য ছবির চরিত্রবৈশিষ্ট্য অপেক্ষা অনেকাংশেই স্বতন্ত্র।

বর্তমান ভারতীয় চিত্রপ্রবাহে তায়ের মেহতা উজ্জ্বল শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। শিল্পভাষায় নতুন রীতি প্রয়োগের সন্ধানে যাঁরা আন্তরিক অন্বেষী, তায়ের তাঁদেরই একজন। শিল্পীর বুদ্ধিবাদী প্রয়োগ হয়তো আবেগধর্মী রসিকজনকে সার্বিক তৃপ্তিগ্রহণে বাধা দেয়, তবু শিল্পীর নিজস্ব ভাষার চূড়ান্ত সার্থক রূপায়ণকে স্বাগত জানাতে রুচির ভিন্নতা কোন বাধা হয় না। শিল্পী হিসেবে এখানেই তায়েব মেহতার সাফল্য আর স্বীকৃতি। প্রদর্শনীতে আশানুরূপ দর্শক-সমাগম না হলেও যাঁরা শিল্পীর কাজ দেখার সুযোগ পেলেন, তাঁদের সঞ্চয় খুব সামান্য নয়।

ওড়িয়া সাহিত্যে সচ্চিদানন্দ রাউতরায় ও তাঁর কিছু কবিতা

এষা দে

ওড়িয়া কবি সচ্চিদানন্দ রাউতরায় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সচ্চি রাউতরায় নামেই তাঁর প্রসিদ্ধি। জন্ম ওড়িশার খোর্দা শহরে। শিক্ষা কলকাতায় আর কটকে। জীবিকা: মেটিয়াবুরুজে কেশোরাম কটন মিলে শ্রমকল্যাণ দপ্তরে অফিসার, পরে মুখ্য কার্যনির্বাহক অফিসার হিসেবে। মূলত কবি হলেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা এবং গবেষণায় প্রতিভাত। এ পর্যন্ত তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটতিরিশ। তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি কালিদাস নাগ, হুমায়ুন কবির, গোপাল হালদার, প্রিয়রঞ্জন সেন, কে. আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ সাহিত্য-সংস্কৃতি পণ্ডিত ও বোদ্ধাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। এ ছাড়া, রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প।

স্বাধীনতার পর থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন—পদ্মশ্রী, সাহিত্য অকাদমি পুরস্কার, সোবিয়েতল্যাণ্ড-নেহরু পুরস্কার ও সর্বশেষে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৮৬)। অন্ধ্র আর বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট. ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে। সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে ভারতনায়ক পুরস্কার। পশ্চিম ইয়োরোপ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করেছেন আমন্ত্রিত অতিথি ও বক্তারূপে।

রাউতরায়ের প্রধান পরিচয় হল—শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি সমাজের কাছে গভীরভাবে দায়বদ্ধ। সনাতন স্থিতাবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজে গতিসঞ্চারে তাঁর আস্থা যেমনই অটল, তেমনি মুখর তাঁর বিদেশী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধতা। এক কথায়, তিনি মার্কসপন্থীদের সহযাত্রী। তাঁর প্রগতিবাদ শুধু মায়াকোভস্কি অনুবাদে সীমাবদ্ধ নয়, সমকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এক রক্ষণশীল স্থাবর সমাজের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনসাধন প্রয়াসী যাবতীয় গণ-আন্দোলনে তিনি সারা জীবন ধরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। ব্রিটিশ সরকারের রাজরোষে নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁর "রক্তশিখা" (১৯৩৯)। কারাবরণ করেছেন দুবার। হয়তো শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী বৃহত্তর আদর্শবাদের জন্যই তিনি কখনো প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কলকাতায় দীর্ঘ প্রবাসে বাঙালির সাহিত্যসংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর ছোটো গল্প অনুবাদ করেছেন ওড়িয়াতে। বাঙালির সমস্ত বিপর্যয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন দুর্গতদের সাহায্যে—পঞ্চাশের মন্বন্তরে ত্রাণকার্য, '৪৬-৪৭ সনের দাঙ্গায় শান্তিমিছিলে নেতৃত্ব, দেশভাগের পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। অর্থাৎ বাঙালির দুর্দিনে তিনি সাথী হয়েছেন। বহু অবাঙালির মতো বাঙলাকে শুধুমাত্র অর্থ বা প্রতিষ্ঠা অর্জনের উপকরণরূপে ব্যবহার করে শোষকের ভূমিকায় দেখা দেন নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাধনা ভারতীয় উপমহাদেশে সমৃদ্ধ সমন্বয়ের এক মহৎ দৃষ্টান্ত।

অথচ তাঁর ওড়িয়া সত্তা বা উৎকলীয়তা কিছুমাত্র

অবদমিত হয়নি। বরং, খুব কম ওড়িয়া সাহিত্যিকই তাঁর মতো ওড়িশার জনগণের সংগ্রামে মনপ্রাণ নিয়োগ করেছেন। তাঁর যে প্রখর সময়-সচেতনতা ওড়িয়া কাব্যকে সমকালের দ্বারে এনে উপস্থিত করেছে, তার উৎস নিছক পুঁথিপড়া বিদ্যা নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাঁর লেখা অজস্র কবিতা আবৃত্তি ও গান হয়ে ওড়িশার গণজাগরণকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর "বাজি রাউত" নামে দীর্ঘ কাব্যটি। ১৯৩৮ সালে অকটোবর মাসে করদরাজ্যবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়ে বারো বছরের মেয়ে বাজি রাউত ঢেনকানল রাজ্য ও ব্রিটিশ সরকারের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। এই মর্মান্তিক আত্মোৎসর্গকে চিরস্মরণীয় করেছেন সচ্চি রাউতরায় তাঁর "বাজি রাউত" নামে যে ধ্রুপদী কাব্যে, সেটি শুধু যে ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁকে স্থায়ী আসন দিয়েছে তাই নয়—সামন্ততন্ত্র আর ঔপনিবেশিকতার অশুভ সমাবেশই যে মানবতার চরম বিপর্যয়, সেই নগ্ন সত্যটি প্রকাশ করে শোষণের মর্মস্থলটিতে লক্ষ্যভেদ করেছে।

রাউতরায়ের দৃষ্টিতে সাহিত্য কেবলমাত্র মতবাদ বা আন্দোলনের হাতিয়ার মাত্র—এমন ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত। ওড়িশার অতীত, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দরিদ্র শোষিত ওড়িয়া জনগণের প্রতি দরদের চেয়ে কিছু কম নয়। তাঁর পরিচালিত "দিগন্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে শুধু নবীন ওড়িয়া কবি-সাহিত্যিকই নন, অতীত যুগের উপেন্দ্র ভঞ্জ, বলরাম দাস প্রভৃতির সাহিত্যকীর্তিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন। যে সাহিত্যসম্পদ এতদিন "পুঁথি" আকারে সাধারণের নাগালের বাইরে ছিল, তাকে তিনি সবার হাতের কাছে এনে দিয়েছেন। এখন তাঁর বয়স সত্তরের কোঠায়, কিন্তু মননে আর সৃজনে তাঁর জীবনবোধ অপরিবর্তিত। সম্পাদনা ও প্রকাশনসংস্থা পরিচালনায় তাঁর স্বাধীন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী পরবর্তী প্রজন্মের খ্যাতনামা ওড়িয়া লেখকদের সাহিত্যপ্রচেষ্টার তিনিই বোধহয় একমাত্র নিরপেক্ষ সমালোচক।

ওড়িয়া কাব্যের ক্রমবিকাশে সচ্চি রাউতরায়ের স্থান এবং তাঁর কাব্যকৃতির গুরুত্ব নির্ধারণে ওড়িয়া সাহিত্যের পটভূমি একান্তই প্রাসঙ্গিক। তাই অতিসরলীকরণে বিভ্রান্তির ঝুঁকি নিয়েও ওড়িয়া কাব্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত রুচিং উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া ওড়িয়া কাব্যের মৌলিক সৃষ্টির বিষয়বস্তু ছিল মাত্র দুটি—শৃঙ্গাররসাত্মক প্রেম আর তত্ত্বমূলক ভগবদ্‌-ভক্তি। তার নন্দনতত্ত্ব ছিল সংস্কৃত কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং অলংকার ও রীতির দ্বারা পরিচালিত—অর্থাৎ হিন্দু সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থার ফসল। বর্তমান ওড়িশার যে অংশ ব্রিটিশ শাসনে আসে (অর্থাৎ বালেশ্বর, কটক, পুরী ইত্যাদি) সেখানে গড়ে ওঠে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁদের মধ্যে দেখা যায় ওড়িয়া জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, যার পরিণতি আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য। এই নবজাগরণে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন "ওড়িয়া বাঙালিরা" অর্থাৎ ওড়িশায় বাঙালি স্থায়ী বাসিন্দারা। ওড়িয়া ভাষা ও লিপিরক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সাপ্তাহিক "উৎকল দীপিকা"তে (১৮৬৬) গদ্যের সূচনা করেন গৌরীশঙ্কর রায় ("যাঁর স্মৃতিতে কটকে গৌরীশঙ্কর পার্কের নামকরণ"), নাটকে তাঁরই অনুজ রামশঙ্কর রায় ("কাঞ্চী কাবেরী", ১৮৮০), রোমান্স তথা উপন্যাসে উমেশচন্দ্র সরকার ("পদ্মমালী", ১৮৮৮) এবং কাব্যে রাধানাথ রায় (১৮৫৮-১৯১১)। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুগস্রষ্টা রাধানাথ পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে বীজ আহরণ করে ওড়িষ্যার মাটিতে বুনলেন এক নতুন ফসল—সেখানে বন্দিত হল ওড়িশার প্রকৃতি, মহিমান্বিত হল লুপ্তকিংবদন্তীময় অতীত গৌরব ("উষা", "চন্দ্রভাগা", "পার্বতী", "নন্দকেশরী", "চিল্কা", "মহাযাত্রা" প্রভৃতি)। ভিত্তি স্থাপিত হল

ওড়িয়া জাতিসত্তার। মাইকেল মধুসূদনের অনুসরণে তাঁর সমন্বয়ী প্রতিভা প্রাচীন কথাবস্তুকে উপস্থিত করল নবীনরূপে। ওড়িয়া কাব্যে প্রবর্তন করলেন সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাঁর বিরুদ্ধে 'বিজাতীয়তা'র অভিযোগ তোলেন খাঁটি উৎকলীয়তাবাদী প্রাচীন-পন্থী "সত্যবাদী" গোষ্ঠী। প্রাচীন এবং নবীনের দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ করেন পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রপ্রভাবিত "সবুজ" গোষ্ঠীর কবিরা। ওড়িয়া কাব্যে তাঁরা আনেন পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যবোধ, নরনারীর প্রেমে হৃদয়াবেগ আর আকুলতা, এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ছন্দে অজস্র পরীক্ষানিরীক্ষা। বিরোধী পক্ষে অবতীর্ণ হন জনপ্রিয় উগ্র জাতীয়তাবাদী মায়াধর মানসিংহ প্রমুখ কবি-লেখকরা। প্রাচীন বা নবীন, সংকীর্ণ প্রাদেশিক ঐতিহ্য বনাম উদার বিশ্বজনীন উত্তরাধিকার—ওড়িয়া কাব্যের ক্রমবিকাশে ওই দ্বন্দ্বের শেষ পর্যায়ে কলম ধরেন সচ্চি রাউতরায়।

স্পষ্টতই রাউতরায় নবীনপন্থী। রোমানটিক কাব্যের উত্তরাধিকারে তাঁর কবিজন্ম হলেও আধুনিকতায় তাঁর উত্তরণ অতি শীঘ্র ও সর্বাত্মক। সরাসরি বিদ্রোহে ঘোষিত হয় মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত রোমানটিকতার বিরুদ্ধতায়: 'ভগবান আছ কই / আকাশবাতাস গর্জে মোর কানে / বলে যায় 'নেই নেই' ("নবীন" পত্রিকা, ১৯১১)। কঠোর বাস্তব থেকে পালাবার মনোভাব বর্জন করে আর্থ-সামাজিক প্রত্যক্ষ স্তর থেকে গভীর অবচেতন-অনুভূতি পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা এক অখণ্ড অভিব্যক্তি পায় তাঁর কাব্যে। তাঁর কবিতার উপজীব্য মানুষ পৌরাণিক চরিত্র থেকে শুরু করে কৃষক-মজদুর-নিম্নমধ্যবিত্ত, ঘটনা, ঘটনাস্থান নিউইয়র্ক থেকে দেবতাত্মা হিমালয়। ওড়িয়া কাব্যে তিনি এনেছেন এক বিশাল ব্যাপ্তি। বিষয়বস্তুর এই সম্প্রসারণ উপযুক্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছে পোশাকি সংস্কৃতপ্রধান ভাষারীতি পরিত্যাগ করে বাকভঙ্গি-নির্ভর এক নমনীয় ভাষাশৈলীতে। জীবনের অভিজ্ঞতা আর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তিনি আবেগ ও মননের সমীকরণে উপস্থিত করেছেন এক নিজস্ব সৃষ্টি, যেখানে পরম্পরাকে স্বীকার করে অনাত্মীয়কে গ্রহণ করা সম্ভবপর। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছেন গদ্যছন্দ। সরাসরি বর্ণনার পরিবর্তে আধুনিক রীতিতে প্রতীকধর্মী ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেছেন বিষয়বস্তু। তাঁর নায়িকা নিতান্তই সাধারণ মেয়ে: 'মুখ তার ব্রণদুষ্ট, হাতে তার চামড়ার ব্যাগ'; নায়কের সঙ্গে তার বহুকাল বাদে দেখা 'সাবানের ফেনার মতো ফিকে জ্যোৎস্নায়।' ১৯৪৩ সালের সাপ্লাইয়ে চাকুরির অবমাননা ও গ্লানি ফোটে নগ্ন বাস্তবের চিত্রকল্পে: তাঁর 'খাকি হাসি'। 'প্রতিমা নায়কে' যে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতার প্রতিভূ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আধুনিক ওড়িয়া কাব্যের বিবর্তনে সচ্চি রাউত-রায়ের স্থান তাই কেন্দ্রগত ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পরে প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব অর্থহীনতায় পর্যবসিত। পরবর্তী প্রজন্মের ওড়িয়া কবিরা তাঁর অনুসৃত পন্থাই গ্রহণ করেছেন—অর্থাৎ দেশের (বা প্রদেশের) বাইরে সাহিত্যসংস্কৃতিভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার প্রকাশ। সচ্চি রাউতরায় ওড়িয়া কাব্যে কবির কবি।

তবে কিছু তরুণ কবিদের কালাহাণ্ডিতে অনাহার বা আদিবাসী শোষণ ইত্যাদি নিয়ে সাম্প্রতিক লেখালেখি ছাড়া সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে ষাটের দশকের ওড়িয়া কবিরা—যাঁরা আজ ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম সারিতে—জনজীবন থেকে যেন একটু বিচ্ছিন্ন। তাঁদের সৃজনে সচ্চি রাউতরায়ের কালসচেতন সামাজিক দায়বোধ অনুভূত হয় না। তাঁরা রাউত-রায়ের অনুগামী উপজীব্য বিষয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে, ভাষাশৈলী ও কাব্যকলায়। এর কারণ সাহিত্যে ধারাবাহিকতার অনুসরণ ও বিরুদ্ধতার মিশ্র জটিল বক্রগতি নাকি ওড়িয়া সমাজের বর্তমান অবস্থায় মধ্যবিত্তের নিরাপদ দূরত্বপ্রিয়তা—একমাত্র ভাবী-

কালই বোধহয় যথাযথ বিচার করবে।

দীর্ঘ সৃজনশীল জীবনে রাউতরায়ও কোনো এক বিশেষ পর্যায়ে থেমে থাকেন নি। তিরিশের দশকের উন্মাদনা ও রাজনৈতিক আদর্শে মনপ্রাণ সন্নিবেশ; আশির দশকে প্রাকৃতিক নিয়মেই গতিপ্রকৃতি পালটেছে। তবে জীবনমুখী কাব্যচর্চা তাঁর স্থায়ী কবিচরিত্র। এখানে আমরা তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টির কিছু নমুনা উপস্থিত করছি।

চিত্রবাঘ

ফুলপেজে তুমি না বলেছিলে আঁকতে
একটি বাঘের ছবি
আমার হাতে গুঁজে দিয়ে খড়িটাকে
বলেছিলে, বাঘ কেমন তা তো আমি দেখি নি।
আমি বলি, বাঘ আমাকে খাবে নিশ্চয়
এই হচ্ছে জ্যোতিষীর বাণী
জন্মকুণ্ডলী আমার দেখে বলেছেন
ছোটবেলায়, তাই পিতা আমার
গ্রামগঞ্জ থেকে দূরে এনে
রেখেছেন আমাকে নিশ্ছিদ্র অট্টালিকায়
চারিদিকে সাত হাত জলের পরিখা
পাহারা দেয় সান্ত্রী ও লস্কর।

শেষে আমার সঙ্গে জুড়ে দিলেন তোমাকে।
এইখানে থাকা।
এই আমাদের জগৎ।
ঘুম আসে বনফুলের সুবাসে
ঘুম ভাঙে অজানা পাখির কাকলিতে
ভোর হলে।
কিন্তু তুমি নাক ফুলিয়ে জেদ ধরলে,
আমি নাচার, কীইবা করতাম?
দেখো-না! একী! ফুলে উঠছে বাঘের গোঁফ
নির্জীব দেওয়ালে আস্তে আস্তে ল্যাজ নড়ে
আমার দিকে তাকায় সে বাঘ, ঠোঁটে তার মরা হাসি
ক্রমশ জীবন্ত হয়
চাঁপাফুল গায়ে খাড়া খাড়া দাগ ধনুকের
বাঘটির চাহনির মসৃণ বক্রতা
আমাকে গ্রাস করে! এই রে, বাঘ এল বলে।
জ্যোতিষীর কথা তাহলে মিথ্যে হবে না।
কাঁপছ নাকি ভয়ে? দেখনি কি অদৃষ্টের পরিহাস?
আমি প্রস্তুত, ছেড়ে দাও আমাকে।
আমিই দেব প্রথম আহার আমার সৃষ্টিকে।
এতেই তো আমার সার্থকতা।
আমিই আমার ভয়ঙ্কর ইচ্ছার সওয়ার
আবার তারই শিকার।

ব্রহ্মাণ্ডভূগোল

পথঘাট নিঝুম
শোনা যায় খালি যা বাতাসের হু হু
আশেপাশে জানালা দিয়ে শোনা যায় গভীর ঘুমে
কে যেন (নারী এক) কথা বলে নিজের সঙ্গে।

এবং আমি বেদনাহীন যন্ত্রণাতে
শুনি আমার নিঃশ্বাস
ছায়াভুক আমার আত্মাপুরুষ
বাতাসের সুতো ধরে মাপতে বসে
দ্বাদশ অঙ্গুলি নিজের পরিধি
মনে হয় সেথা হতে ব্রহ্মাণ্ডভূগোল
পিণ্ড ও পদার্থ
পিণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত চেতনার নীল অক্ষবৃত্ত।

আমিই খবর দিই আমাকে
আমিই দিই উত্তর যা হয় খালি এক প্রশ্ন।

প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নের আবর্ত
গত ও আগত সব ঘটনার
ভেট, মুখোমুখি নীলপ্রস্থ ভবিষ্যৎ

আমিই জিজ্ঞাসা করি আমিই শুনি
আরও জিজ্ঞাসা।
যে শুক সেই পরীক্ষিৎ।

কারণ শব্দের দৌড়ই বা কতদূর
অর্থ অর্থান্তর সবই কুয়াশার চুম্বন
কী বুঝেছ এখন?
কীইবা সে জানে!
সবই শুধু ধোঁয়ার আংটির
মতো শূন্যকে দেখা।

শূন্য শূন্যান্তর
জড় থেকে চেতনা
এবং চেতনা থেকে চেতনোত্তর
এই আমার পরিমাপ
পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড?
কিন্তু সেখান থেকে কী?
আদি কী শেষ কী
এই মৌল প্রশ্ন
সৃষ্টি করে বহু শত
প্রশ্নের আকাশ।
আমি এক হংসের মতো
খেলা করি সেথা আত্মরহস্যে।

নিদ্রা

ভুজঙ্গ শয়নে নিদ্রা আসে পুনরায়
নাভিমূলে কমল ফুটিয়ে
জন্ম নেন ব্রহ্মা
রচনা করেন বেদ
ধন্য বটে সেই নিদ্রা।
দুলিয়ে চামর ক্ষীরসিন্ধুর
গঙ্গা ধুয়ে দেয় পা
শেষ হয় অমৃত মন্থন
তারপর পুনরায় সেই নিদ্রা।

কে আগে কে পরে
কিছুই জানা নেই।
সত্তা সেই নির্বিকার
অবিভাজ্য স্থিতি
দূরের মধ্যে আরও দূরত্ব
হারায় সময়ের গতি।
নিদ্রারূপী কোনো যোগমায়া
আচ্ছন্ন করে
মনে হয় সমস্ত সৃষ্টি
সে নিদ্রাতে জন্ম নিয়ে
সে নিদ্রাতে হয়ে যায় লীন।
সে নিদ্রাতে মুছে যায়
চরাচরবাসীর প্রার্থনা
যত কদর্থনা।

পাশে দাঁড়িয়ে শাকম্ভরী দেবী
রক্ত, অশ্রু ঘামে ভেজা
সে এই পৃথিবী
তোমার যোগনিদ্রাজাত
সে আজ আগত
জাগরণে তার
জাগো নারায়ণ।

খ্রী ২০০০

বেহালার মতো মুখ নিয়ে
আমি যখন আসব
অনেক তন্দ্রাতে
সাদা শঙ্খকে বাজিয়ে
পিতলের স্বরে
হয়তো মুশকিল হবে নিজেকে চেনা
আমার পক্ষে।
কারণ আমি নিজে বদলে যাই
প্রতি মিনিটে
শেষে কী হবে নিজের জানা নেই।
যেমন জানে না নিরুদ্দেশযাত্রী
কোন্ ট্রেনের হুইশল
কোন্ দিকে গেছে রাস্তা
কোথায় বা শেষ।

তোমরা সবাই যারা আমাকে আগে থেকে জান
বিনিদ্র রাত পুইয়েছ আমার
লকলক জাহ্নব আগুনে

পিতলের পোকা।
অণুর ওড়না খুলে মুখ চাইব
আমি কি সেই বেদবতী
(অথবা আম্রপালী।)
হয়তো পাবে না পরিচিত স্বর
আমার কণ্ঠ হতে……
(শ্রদ্ধা অথবা মালিনী রাগে।)
কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আসব ফিরে পিতল
বাষ্পে-বাষ্পে ধাতুর সিঁড়িতে
উন্মার্গ নিশানে
নৈর্মানব ইচ্ছার প্রাঙ্গণে।

জানে না।
তোমরা সব কোথায় থাকবে
এখানে না আর কোনো ঋতুর চাতালে
পিঁপড়েরা সব
চেয়ে থাকবে গজদন্তমিনারের দিকে
পাখিরা সব
হয়তো বা ঠোকরাবে নিরপেক্ষ মাটির কঙ্কাল।
ঘাসেরা
সঙ্কোচের দাঁত হয়ে
চিবোবে মানুষের নিরীহ পা।
এবং নদীসকল
সেদিন বিবস্ত্র হয়ে
জলতে, জ্বালাতে চাইবে
তাদের জন্মার অঙ্গারে
পৃথিবীর আদিঅন্তশেষ।

ত্র্যহস্পর্শ

মেঘেরা আসে যায়
তাদের জিজ্ঞাসায় লাভ নেই।
কনট্রাকটারদের মতো তারা
খালি চেহারাই দেখায়।

তথাপি জানা ছিল মন্বন্তর হবে,
জানা ছিল ব্যাঙের ঠ্যাঙের মতো
পেঁয়াজও বিদেশে যাবে চালান
এবং বেড়ে যাবে দরদাম
সব জিনিসের
কেবল মনুষ্যজীবন ছাড়া।

আরও বা কোথায় জানা ছিল
অদলবদল হবে
পাশাকাঠির মতো
দল উপদল
মানুষের হাড়ে গড়া সে কপট পাশা।

এবং এটাও কি জানা ছিল
পণ্ডিতদের
হবে নির্বাসন।
বহুধা হইবে বিপ্রে।
এত সত্ত্বেও আমি বোকারাম
কিছুই তো জানি নি।
করি নি কোনো একটা কাজ
আগেভাগে
বেলাবেলি বিচার করে
কিনি নি চাল বা চিনি
পাঁচ কিলো পেঁয়াজ বা তেল
আগেভাগে।
শেষে দেখি নি আমার নাম
ভোটার-তালিকায়
আমি দেখেছি বিধি মোর বাম
নইলে কি আর আমি ঘুরে বেড়াই
ছেড়ে ঘরবাড়ি এমনসময়ে
যেখানে সেখানে যেন ভবঘুরে।
বুদ্ধি থাকলে ধনার্জন না করে
মোলায়েম হাত তুলে
এ গ্রহের রাত্রিদিন
গুনতাম
অঙ্গেতে নেভাতাম
ত্রিভুবনজ্বালা।

ঘণ্টাখানেকের সমুদ্র

ঘণ্টাখানেকের সমুদ্র মানে এক সময়।
সময়ে যা হারিয়ে যায়
তাকে ধরে রাখে নিঃসময়।
আমি তাতে হারিয়ে যাই
আমি তাতে জন্ম নিই।
যা বাঙ্ময়
তা হয় নিঃশব্দ প্রকাশ
তাতে ঝরত হয়
বহু মৃত কণ্ঠের কোরাস।

আমি আবার ফিরে যাই স্মৃতিসত্তার মাঝে
এবং আমার পূর্বপুরুষ
যাঁদের উদ্দেশে আমি তিলতর্পণ করি
সমুদ্র বালিতে,
পিণ্ড গ্রহণের জন্য,
তাঁরা আসেন
আমার হাত থেকে।
এবং
আমার পুত্র ও পৌত্রের হাত থেকে
আমার সঙ্গে তাঁরা আসবেন
ঝাপসা জ্যোৎস্না, মরা নদী
ছড়িপাথরের খেলার ভেতরে।

এক ব্রহ্মাণ্ড
লোপ পেয়ে যায়
সৃষ্টি হয় আর-এক ব্রহ্মাণ্ড।

মতামত

১

"কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার লোকরাও আগে থেকে তৈরি ছিল"

আপনাদের জানুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয়ের কলকাতার দাঙ্গা বিষয়ক প্রবন্ধে একটি তথ্যের ভুল আছে। দাঙ্গা যে বছর অগস্ট মাসে বাধে আমি সে বছর জানুয়ারি মাসের গোড়ায় ময়মনসিং জেলায় বদলি হই। শ্রীঅশোক মিত্রও সে সময় সেখানে ছিলেন। আমি জেলা জজ, তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আমার পরিষ্কার মনে আছে—সে সময় গভর্নরের শাসন চলছিল। কেসী সাহেব ছিলেন গভর্নর। তিনি বারোজ সাহেবকে শাসনভার দিয়ে বাঙলাদেশ থেকে বিদায় নেন। মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সার নাজিমউদ্দীন নির্বাচনে দাঁড়ান না। সুহরাবর্দী সাহেব নির্বাচনে জিতে মুসলিম লীগের বিধায়ক দলের দলপতি নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টারি প্রথা অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলপতিকেই প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গঠনের ভার দিতে হয়। সেক্ষেত্রে গভর্নরের কোনো স্বাধীনতা নেই। সুহরাবর্দী সাহেব মুসলিম লীগ বিধায়ক দলের দলপতি বলেই বারোজ সাহেব তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছিলেন। তখনকার দিনে প্রধানমন্ত্রীই বলা হত।

ত্রিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লনডন থেকে 'ট্রান্সফার অভ পাওয়ার' নামক বারো খণ্ডে সমাপ্ত একটি মহাভারত প্রকাশ করেছেন। সেই গ্রন্থের সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম খণ্ডে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালের আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্রের বিশদ বিবরণ আছে। কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা তার অন্তর্গত বিষয়। শ্রীঅশোক মিত্র যদি সে গ্রন্থ না পড়ে থাকেন তবে তাঁকে পড়তে অনুরোধ করি। আমি যে চার খণ্ড পড়েছি তা পড়ে আমার বহু ভুল ধারণা দূর হয়েছে। নোয়াখালির জন্যে দায়ী মুসলিম লীগের টিকিট না পেয়ে রুষ্ট গোলাম সারওয়ার। সুহরাবর্দী নন। মুসলিম লীগও নয়। কলকাতার জন্যে সুহরাবর্দীই একমাত্র দায়ী নন। কতটা পরিমাণে নাজিমউদ্দীনও দায়ী। তিনি তখন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি, 'স্টার অভ্ ইণ্ডিয়া' পত্রের মালিক বা কর্তৃপক্ষ। একহাতে তালি বাজে না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার লোকরাও আগে থেকে তৈরি ছিল। 'লড়কে লেঙ্গে'র জবাব লড়ে দিতে।

কেউ ভাবতেই পারেন নি যে দাঙ্গা এত ভয়াবহ আকার নেবে। সার ফ্রেডারিক বারোজ ইঞ্জিন ড্রাইভার থেকে শ্রমিকদলে উঠতে-উঠতে ভারতের সেরা প্রদেশের গভর্নর হন। তিনি যদি সার জন অ্যানডারসন হতেন, কড়া হাতে দমন করতে পারতেন। তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শুরু হলে তিনিও পারতেন না। বারোজ আসছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই আগে টের পেয়েছে যে ইংরেজরা যাচ্ছে, তারা ফাঁসি দিতেও পারবে না, জেলে দিলেও ছাড়া পেতে কতক্ষণ?

পরবর্তী জানুয়ারি মাসে বারোজ সাহেব ময়মনসিং পরিদর্শনে যান। আমাকে ও আমার স্ত্রীকে ডিনারে ডাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি থাকতে কলকাতায় দাঙ্গা বাধল কেন? বাধল যদি তো আপনি বন্ধ করলেন না কেন।' তিনি ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে উত্তর দেন, 'হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় তো লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব?' রিং মানে বক্সিং রিং। 'আমরা চলে যাচ্ছি। আয়ারল্যানড থেকে চলে গিয়ে আমাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে এদেশেও আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হবে।'

আমি তো হাঁ! ওঁরা তা হলে সত্যি-সত্যি চলে যাচ্ছেন! তা হলে ওঁদের দায়ী করে আমাদের কী লাভ? আমার বিশ্বাস ছিল শেষ মুহূর্তে হিন্দু-মুসলমানে, কংগ্রেসে-লীগে একটা মিটমাট হবে। তার ফলে বাঙলাদেশে হবে কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলী। কোয়ালিশনের বিকল্প গভর্নরের শাসন নয়, পার্টিশন।

কলকাতার দাঙ্গার পর শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা বারোজ সাহেবকে অনুরোধ করেন গভর্নর্স রুল জারি করতে। তিনি রাজি হন না। সুহরাবর্দী সাহেবকে তিনি পরামর্শ দেন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে। সুহরাবর্দী প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কংগ্রেস হাইকমানড সর্বত্র কোয়ালিশনে রাজি না হলে লীগ হাইকমানড বাংলাদেশে কোয়ালিশনে রাজি হবেন না। একজন লীগপন্থী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোয়ালিশনের প্রস্তাব করেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'আমি কোয়ালিশনে বিশ্বাস করি নে।' ভারতবর্ষের মতো দেশে, বাঙলাদেশের মতো প্রদেশে কোয়ালিশন ছাড়া আর কোন্ প্রকার সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে? কোথাও হিন্দু সংখ্যালঘু, কোথাও মুসলিম সংখ্যালঘু, কোথাও শিখ।

সুহরাবর্দীর চেয়ে যোগ্যতর মন্ত্রী সাঁইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ—এই দশ বছরে আমরা দেখি নি। কোয়ালিশন হলে তিনিই হতেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের যিনি আস্থাভাজন, অধিকাংশ হিন্দুর চোখে তিনি গুণ্ডার সর্দার। আর তাঁর দলটিও গুণ্ডার দল। তাঁদের হাত থেকে বাঁচতে হলে চাই তাঁদের পাল্টার ওপারে চালান করে দেওয়া। অন্তত কলকাতা তো নিষ্কণ্টক হবে। হলও শেষ পর্যন্ত তাই। অনুতপ্ত সুহরাবর্দী তখন কলকাতার মুসলমানদের বাঁচাতে মহাত্মা গান্ধীর শরণ নিলেন। সেটাও সম্ভব হল। কথা ছিল গান্ধীজীকে পরে তিনি নোয়াখালি নিয়ে যাবেন ও সেখানকার হিন্দুদেরও বাঁচাবেন। রাজনীতিতে আর তাঁর স্থান ছিল না। নাজিমউদ্দীন সাহেব পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী। হঠাৎ দিল্লী থেকে বার্তা পেয়ে গান্ধীজী নোয়াখালি না গিয়ে দিল্লী যান ও সেখানেই নিহত হন। সুহরাবর্দী দুই বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যান। তাঁকে শেষ দেখা যায় করাচীতে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে। পরে গদিচ্যুত হয়ে বেইরুটে মৃত্যু।

সেকালের অভিনেতাদের কেউ বেঁচে নেই, থাকলেও পরিত্যক্ত। তাঁদের প্রতি সুবিচার করা উত্তরকালের লেখকদের কর্তব্য। বিশেষ করে ইংরেজদের ও মুসলমানদের প্রতি। সুহরাবর্দী সাহেবকে আমি দেখি নি, কিন্তু নাজিমউদ্দিন সাহেবকে আমি চিনতুম। তিনি ছিলেন একবার আমার লাঞ্চের অতিথি আর আমি তাঁর ডিনারের অতিথি। আমি তখন নদীয়ার অস্থায়ী কলেকটর আর তিনি গভর্নরের শাসনপরিষদের সদস্য। তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বলেন, 'শুনে সুখী হবেন নওগাঁও থাকতে আপনি যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন সরকার তার স্কীম গ্রহণ করেছেন।' পরের দিন চুয়াডাঙ্গায় কয়েক হাজার কৃষক-প্রজা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁকে ঘেরাও করে। আমার পুলিস সুপার আর আমি তাঁকে উদ্ধার করি। সে সময় কৃষক-প্রজা আন্দোলন জোর কদমে চলছিল। হিন্দু-মুসলিম ভেদ ছিল না। সেদিন সভাস্থলে আমি তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দিতে গেলে তিনি হেসে বলেন, 'আপনি দেখছি আনাড়ি।' আমার হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নিয়ে আমার সিগারেট ধরিয়ে দেন। সার্কল অফিসার ইয়াহিয়া শিরাজী অসুস্থ শুনে তিনি তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করেন। দয়ামায়া, ভদ্রতা, সত্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি—সমস্তই তাঁর ছিল। কিন্তু সুহরাবর্দী সাহেবের পরিবর্তে তিনি যদি ছেচল্লিশ সালের অগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতেন তা হলে তিনিও কি দাঙ্গা ঠেকাতে বা থামাতে পারতেন?

না। ডাইরেকট অ্যাকশন ঘোষণা জিন্না সাহেবের আদেশ। সে আদেশ উপেক্ষা বা অমান্য করা কারো সাধ্য নয়। না সুহরাবর্দী সাহেবের, না নাজিমউদ্দীন

সাহেবের। উপেক্ষা বা অমান্য করলে মুসলিম লীগ থেকে তাঁদের নাম কাটা যেত। 'লড়কে লেঙ্গে' পাকিস্তান তখন মুসলিম লীগ পলিসি। জিন্না সাহেব বলেছিলেন তাঁর হাতেও পিস্তল আছে। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে আর তাঁর বিশ্বাস নেই। সোজা কথায়—লড়তে হবে অস্ত্র হাতে। প্রধানমন্ত্রী পদে যিনিই থাকুন তাঁর কর্তব্য হত পদত্যাগপূর্বক সংগ্রামে যোগদান। কিন্তু সেই প্রাথমিক কাজটি সুহরাবর্দী বা নাজিমউদ্দীন কেউ করতেন না। গুণ্ডাকে বলতেন, গুণ্ডামি করো। পুলিসকে বলতেন, গুণ্ডামি ধরো। পার্লামেনটারি ডেমোক্রাসিতে এমন ব্যাপারে কেউ কখনো দেখে নি। বারোজ সাহেবের উচিত ছিল মুসলিম লীগ সরকারকে বরখাস্ত করা। কিন্তু তা হলে জিন্না সাহেব জেহাদ ঘোষণা করতেন। 'ট্রান্সফার অভ পাওয়ার' গ্রন্থের পরে এক জায়গায় জেহাদের সম্ভাব্যতার উল্লেখ আছে। জবাহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন, জিন্না তাঁর ক্যাবিনেটে সাধারণ একজন মন্ত্রী হবেন, এটা অপমানকর। মুসলিম লীগের সদস্য নন এমন মুসলমানকে কংগ্রেস তার দলের মন্ত্রী করবে এটা অমার্জনীয়। সুহরাবর্দী তথা নাজিমউদ্দীন জিন্না সাহেবের আজ্ঞাবহ সৈনিকমাত্র।

অগস্ট মাসের দাঙ্গা জেহাদের ওয়ার্নিং। পাকিস্তানের দাবিতে জিন্না সাহেব অটল। ইংরেজরাও তাঁকে বোঝাতে পারেন নি পাকিস্তান পেতে হলে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হারাতে হবে। ইতিহাসের সেই মুহূর্তে জিন্নাই মুসলিম লীগ আর মুসলিম লীগই মুসলিম সম্প্রদায় বা মুসলিম নেশন। জিন্নাকে শত্রু করার সাহস ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। কারণ সারা ভারতের বেবাক মুসলমানই বিদ্রোহী হত। হিন্দুদের হাতে গোটা ভারত সঁপে দেওয়া ব্রিটিশ পলিসি ছিল না। কারো হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই ইংরেজরা বিদায় নিত অথবা দুইজনের হাতে দু'ভাগ দিয়ে যেত। সেটাই মন্দের ভালো বলে কংগ্রেস নেতারা মেনে নেন। লীগ নেতারাও। ইংরেজের সঙ্গে উভয়ের সমঝোতা হল, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তাই হল না। ঝগড়াও মিটল না।

অন্নদাশঙ্কর রায়
কলিকাতা-১৯

২

'মানবিক বৃত্তি ষড়যন্ত্রের অভিঘাতে ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়ে যায় নি'

"চতুরঙ্গ"র ফেবরুয়ারি-মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় অশোক মিত্রের লেখা পড়লুম—ওঁর কর্মময় জীবনস্মৃতি। এই লেখায় তিনি নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

আমি প্রত্যক্ষদর্শী। এ বিষয়ে আমার লেখা নয়াদিল্লির প্রসিদ্ধ সংস্থা "ইনফা" ছেপেছেন। ১৯৮৯ সালের ৮ই নভেমবর শেষ প্রবন্ধ থেকে খানিকটা অংশ আমি লিখে দিলাম। অশোকবাবুকে পাঠালে খুশি হব।

শ্রী মিত্র লিখেছেন—'এটি আমার আত্মকথা, ইতিহাস নয়। আমি নিজে যা দেখেছি, তাই লিখে যাচ্ছি।'

আমার বাড়ি বিক্রমপুরে কিন্তু জন্মেছি কার্তিকপুরে। অধ্যাপক কবির আর আমি এবং মুজিব সাহেব সগোত্র। আমি উভয়কে জানিয়েছিলেম আমাদের আত্মীয়তার কথা। জীবনধর্মের একাত্মতা।

মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট পরিবারের সত্যিকার পরিচয় পেয়েছি শিশুবয়সে। কাতিকপুরের চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে আমার পিতামহ আর পিতার নিবিড় সম্বন্ধ। ওই বিরাট জমিদারির ম্যানেজার হিসেবে। ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী হিন্দু এবং মুসলমানের অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না। ১৯৪৩ সাল থেকে দিল্লিতে রয়েছে ১৯৮৬ পর্যন্ত। মৌলানা আজাদ, রফি সাহেব এবং খানদানি মুসলমানের স্নেহ ও প্রীতি পেয়ে আমি ভুলে গেছি আমি ছিন্নমূল।

ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে যোগ্য যন্ত্র হিসেবে কাজ করবেন শহীদ সুহরাবর্দী। লাটসাহেবের পদে নিযুক্ত হয়ে এলেন স্যার ফ্রেডারিক বারোজ। ১৯৪৬ সালের প্রথমভাগে তিনি ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে ঢাকার "আসান মঞ্জিল" ক্রীড়নক হয়ে কাজ করবে না।

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর অন্তত পঁচিশ বৎসর শিল্পপতি ব্রিটিশদের একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত থাকবে--এই আশ্বাস নাজিমুদ্দিন বা নবাব বাহাদুর হবিবুল্লা দেবেন না। কারণ তাঁদের স্বপ্নের সৌধ সীমায়িত করার কোনো কারণ নেই। লর্ড কার্জন ঢাকায় বসে আশ্বাস দিয়ে গেছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে।

শহীদ সুরাবর্দী কলকাতার লোক। কলকাতাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে এই ধরনের পরিমার্জিত পরিবারের কর্মপ্রাণ, উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত লোককে বশংবদ সহযোগী নির্ণয় করা সমীচীন। ফলে, বারোজ সাহেব সুযোগমত সুরাবর্দীকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেন। শুরু হল কূট রাজনীতির খেলা।

১৬ই অগস্টের নারকীয় ঘটনার প্রস্তুতি চলেছে অনেক আগে। মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন ব্রিটিশ শাসক ও শিল্পপতিরা।

আমি ঢাকা শহরে পড়াশুনো করেছি। লীগের জন্ম ঢাকাতে ১৯০৬ সালে। দশ বৎসর বাদে আমি ঢাকায় এসে ওঁদের কর্মপন্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করেছিলেম। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কী করে প্রজ্বলিত হতে পারে, কারা সব ইন্ধন সংগ্রহ করেন, আমরা জেনে নিয়েছিলাম। ১৯৩০ ও ১৯৪০ সালে দীপ্ত অগ্নি দাবানলে পরিণত হল।

শ্রী মিত্র লিখেছেন, হিংসা ও হত্যাকাণ্ডের কথা। এইসব বিষয় ধোঁয়া। উৎস কোথায়? ইতিহাসের ছাত্র খুঁজে বার করবেন। আমরা চেষ্টা করেছি বিপন্ন ও অসহায়, বিশেষ করে শিশু আর নারীদের আশ্রয় দিতে।

শ্বাসরোধকারী পরিবেশে কত লোক আমাদের সহায়ক। ১৯৪০ সালে আমি বরিশাল থেকে ঢাকায় পৌঁছেছি। ঢাকা হলে' অন্তত চারশত লোক আশ্রিত হয়েছিল। পাঁচটি আবাসিক ছাত্রসহ আমি মেয়েদের হলে যাই। পাঁচটি মুসলমান মেয়ে এসে আমাকে বললেন, 'দাদা "ঢাকা হলে" যেতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু লীগের অভিসন্ধিমূলক প্রচারে গোটা শহরে আগুন জ্বলে উঠবে।'

ওঁদের ইচ্ছেমত এক মুসলমান অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছিলেম। আমার জীবনে নতুন শিক্ষা। সমস্ত বাঙলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার হীন ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়েছে ঢাকায় "আসান মঞ্জিল"এ। খানদানি ও ভদ্র নবাব বংশের শিক্ষিত লোক নাজিমুদ্দিনের উল্লেখ করেছেন শ্রী মিত্র। খুবই সত্যি কথা। তিনি জনসম্পর্কের ভার দিয়েছিলেন ওঁর ভ্রাতা শাহাবুদ্দিন সাহেবের উপর। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও চতুর রাজনীতিজ্ঞ।

ওঁর আওতায় কাজ করার বিশিষ্ট কর্মী তিনি বাছাই করে নিয়েছিলেন। আমার সহাধ্যায়ী ফজলুর রহমান এক নামকরা স্বেচ্ছাসেবক ও সেনানী। ওঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু আমরা সমধর্মী নই। তবুও আমি চেষ্টা করেছিলাম, যাতে সাম্প্রদায়িকতার ধ্বংসাত্মক কাজে ওঁর পৌরুষ অবক্ষয়িত না হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ইউনিভারসিটির সংরক্ষিত আসনে লীগের মনোনয়ন পেয়ে রহমান আমার কাছে সহায়তার জন্য আসে। আমি শুধু জিজ্ঞেস করি—'তুমি বিক্রমপুরের কৃষকসন্তান, নবাব বাহাদুরের প্রাসাদে ছুটোছুটি করছ কেন?'

শ্রী মিত্র ঠিকই লিখেছেন, ১৬ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি ছক আগেই স্থির করে শহীদ সুরাবর্দী আসরে উপস্থিত হন: এটি ছিল মুখ্যত প্রশাসনিক রাজনীতি। হতে পারে—পরিণাম কোথায়

গিয়ে দাঁড়াবে, লীগ নেতারা ভাবতে পারেন নি। অবাঙালিদের উত্তেজনা কতদূর পৌঁছবে, পরিমাপ করেন নি এই ষড়যন্ত্রকারীর দল।

নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। আমি ১৯৪৬ সালের সেপটেমবর মাসে…নেহরু ও সরদার প্যাটেলকে বুঝিয়ে বলেছিলেম—পূর্ববঙ্গের মুসলমানপ্রধান এলাকায় লীগ, ব্রিটিশ জেলাধীশ ও পুলিশ সাহেবের প্ররোচনায় অসম্ভব নির্যাতন চলবে। লর্ড ওয়েভেলকে তিনি যেন সতর্ক করে দেন।

শ্রী মিত্র এই কথা ঠিক লিখেছেন যে ধর্মনির্বিশেষে কলকাতাবাসী বাঙালি দাঙ্গা থামাবার জন্য বিশ্বাস ও সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। মানবিক বৃত্তি ষড়যন্ত্রের অভিঘাতে ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়ে যায় নি।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৩

ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে হিন্দু মনাষীদের মূল্যায়ন

"চতুরঙ্গ"-পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনায় সুধী অধ্যাপক ও প্রবন্ধলেখকবৃন্দ যে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তা পড়ে মনে হয় যেন পুরো বইটাই পড়া হয়ে গেল। তাঁদের এই গভীর নিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। "চতুরঙ্গ" পত্রিকার কোনো বিশেষ সংখ্যা আমার নজরে পড়ে নি, তথাপি (ডিসেমবর ৮৯)-এর সংখ্যা আমার কাছে বিশেষ সংখ্যারূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। এই সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখা প্রবন্ধ "এক সাংস্কৃতিক অন্বেষা"। এবং খাজিম আহমদের গ্রন্থসমালোচনা "বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চোখে ইসলামের অবদান" সম্বন্ধে আমার এই পত্র।

আমাদের উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান মনীষীরা উভয় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের যে মতামত এ প্রজন্মের মানুষদের জন্য রেখে গিয়েছেন, তা যদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের চেতনা প্রসারিত হয়, কিন্তু এ ধরনের মানবিক বিষয়-গুলোর আলোচনা একান্তই বিরল। ব্যতিক্রম "চতুরঙ্গ" পত্রিকা। সমকালীন জীবনপ্রতিবেশে যে-ভাবে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতায় পীড়িত হচ্ছি, তার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের গ্রন্থসমালোচনায় আমাদের মানবিক চেতনা প্রসারিত হয়। সারা বিশ্বের মানুষ যখন বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে বিস্মিত হচ্ছেন, তখন ভারতবর্ষের মানুষের ধর্মান্ধতায় তাঁরা আরো বিস্মিত হচ্ছেন। এই তথ্যবহুল আলোচনা আমাদের নতুন আলোয় আলোকিতই শুধু করে না, তার সঙ্গে আমাদের মানবিক বোধকে প্রসারিত করে।

'দরাপ খাঁ-ই সংস্কৃতে আটটি শ্লোকে গঙ্গাস্তব রচনা করেছিলেন এবং স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহের মতো বহু নিষ্ঠাবান হিন্দু জেগে বা না জেগে দরাপ খাঁ রচিত স্তব দিয়ে গঙ্গার পূজা করে থাকেন।' এবং সুলতান মাহমুদ সম্বন্ধে ভাষাচার্যের মন্তব্য : 'হিন্দুদের ভাষাকে রাজকীয় মুদ্রায় স্থান দিয়া ইহার প্রতি যে মর্যাদা দেখানো হইয়াছে, তাহা হিন্দুদের বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।' এই তথ্য বিদগ্ধজনের কাছে হয়তো খুব কৌতূহল সৃষ্টি করে না, কিন্তু আমার মতো সাধারণ পাঠকের কাছে সীমাহীন কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

অল্ বীরূণী সম্বন্ধে ভাষাচার্যের গ্রন্থ "সাংস্কৃতিকী" থেকে বিনীতভাবে সামান্য তথ্যের সংযোজন করছি। 'অল্ বীরূণী মধ্যযুগের এক অতি বিরাট পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত। এই বহু-বিদ্যাবিৎ একাধারে গণিত এবং ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিষ্ক এবং দর্শন, রসায়ন এবং ঐতি-হাসিক কালনির্ধারণ, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় তাবৎ বিদ্যায় সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তিনি প্রথম

বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ভারতবিদ্যাবিৎ ছিলেন, এবং তাঁহার মতো ভারত সম্বন্ধে এত বড়ো পণ্ডিত, বিদেশী-দের মধ্যে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিকে ছিল তাঁহার সূক্ষ্ম ও সর্বগ্রাহী পাণ্ডিত্য, আর অন্যদিকে ছিল তাঁহার এক প্রকাণ্ড উদারতা, বস্তুনিষ্ঠা। এই উভয়বিদ গুণের জন্য অল্ বীরূণীকে সমগ্র মানব-জাতির প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে'। (পৃ ১২৩)

'যদিও অল্ বীরূণীর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য গভীর ও বিস্তৃত ছিল, কেবল তাহারই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তিনি কেবল নিছক পণ্ডিত ছিলেন না, ইহার চেয়ে তিনি আরও বড়ো ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়ধর্মী মানুষ, তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস, সম্পূর্ণ অন্য বাতাবরণের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন অন্য একটি জনগণের সভ্যতা-বিষয়ক কৃতিত্বকে কখনো লঘু করিয়া দেখিতে দেয় নাই। (পৃ ১২৪)

'তাঁহার সময়ে অল্ বীরূণী ছিলেন একজন অদ্ভুত দৃষ্টির পণ্ডিত। যখন তিনি তাঁহার মানসিক জীবনের পূর্ণ পরিণত স্তরে ছিলেন, ধরা যাউক আনুমানিক ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৯০০ বৎসরেরও অধিক কাল আগে, তখন নিঃসন্দেহরূপে তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বিদ্বান এবং সকলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।' (পৃ ১২৫)

এই সত্যনিষ্ঠ তথ্য কি আমাদের বোধকে প্রজ্ঞায় পরিণত করে না। ইতিহাসপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এই তথ্যের হয়তো ততটা গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমার মতো সাধারণ পাঠকের কাছে এই তথ্য সীমাহীন গুরুত্বই শুধু বহন করে না, সীমাহীন এক আনন্দও অনুভব করি।

"বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চোখে ইসলামের অবদান" আলোচনা প্রসঙ্গে খাজিম আহমেদ এই সময়ের আলোকে একটি মূল্যবান কথা লিখেছেন : "নব্যহিন্দুবাদীদের আদর্শচর্চার প্রবণতা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছে। অথচ দেশকালের বর্তমান পটভূমিতে তিনি কোনো-ভাবেই অপ্রাসঙ্গিক আর অর্থহীন হয়ে যান নি।'

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা এখনো আছেন যাঁদের উদ্দেশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের 'মার্কাধারী মূর্খ'। এই মার্কাধারী মূর্খরাই প্রফুল্লচন্দ্রের মতো মানবপ্রেমিক বিজ্ঞানীকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতে সদাই নিরত। তথাপি একথাও সত্য যে তিনি বিদ্বজ্জনসমাজে চিরদিনই শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন এবং তাঁদের স্মৃতি থেকে বিলীন হবেন না।

অনিলচন্দ্র সাহা
বাটানগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা